বিদ্রোহী রিয়াং নেতা

রতনমণি

তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত

উপজাতি গবেষণা অধিকার
ত্রিপুরা সরকার।

বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি

লেখক - তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত।

উপজাতি গবেষণা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার।।

সূচীপত্র

(১) রতনমণি ও রিয়াং বিদ্রোহ ৬ - ৪৬ পৃঃ

(২) প্রকাশিত আদেশ ও চিঠিপত্র ৪৭ - ৬৭ পৃঃ

(৩) খুসীকৃষ্ণের গান ও বিদ্রোহে তার প্রভাব ৬৮ - ৭২ পৃঃ

(৪) ত্রিপুরা রাচামুং খাকচাং খুম্বার বাই ৭৩ - ৯২ পৃঃ

(৫) মুক্তারাম ৯৩ -১১২ পৃঃ

বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতনমণি

প্রথম সংস্করণ - মে, ১৯৯৩ ইং

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশক -
উপজাতি গবেষণা অধিকার
ত্রিপুরা সরকার।

মুদ্রণ:-
ভারত অফসেট
১, রোনাল্ডসে রোড
আগরতলা, ত্রিপুরা।
প্রচ্ছদ সিদ্ধার্থ চক্রবর্ত্তী

মূল্য- ৪২.৫০॥

সূচনা

বৈচিত্রময় ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত সমাজে রিয়াং সম্প্রদায় একটি নিরীহ পশ্চাদপদ রাজভক্ত সম্প্রদায় হিসাবেই পরিচিত ছিল। ১৯৪৩ ইং (১৩৫৩ ত্রিং) সনে হঠাৎ শান্ত রিয়াং সম্প্রদায়ের এক অংশে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে ত্রিপুরার তৎকালীন প্রজাদরদী মহারাজা তাদেরকে ডাকাত আখ্যা দিয়ে শায়েস্তা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধর্মগুরু রতনমনি নোয়াতিয়া এবং তার শিষ্যদের নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের জন্য শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠের পর ৺রতনমনির শিষ্যদের সাক্ষ্য নিয়ে এবং নিজের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতায় সাহায্যে 'গোমতী' মাসিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

৺রতনমনি এবং রিয়াং বিদ্রোহ বিষয়ে এই প্রবন্ধ গুলির ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণাধিকার পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করে। শ্রী দাশগুপ্ত নূতনভাবে ভূমিকাটি রচনা করে দেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংশোধন ও সংযোজন করেন। আশা রাখি এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষণামূলক কাজে এই বইটি সহায়ক হবে।

(সাইলিয়ানা সাইলো)
উপজাতি গবেষণা অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

রিয়াং বিদ্রোহ ১৯৪৩

ভূমিকা

১৯৭৩ ইং সনের ৬ই অক্টোবর থেকে শ্রী মনিময় দেববর্মণের ''একটি বিতর্কিত চরিত্র, বিদ্রোহী রিয়াং নেতা রতন মনি'' প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। ২২ ভাগে ২রা নভেম্বর প্রবন্ধটি শেষ হয়। এই প্রবন্ধে তিনি কমরেড অঘোর দেববর্মার লেখা ''রিয়াং কৃষক বিদ্রোহ ও শহিদ রতনমণি''- শ্রী বিমান ধরের লেখা - ''৩য় ও ৪র্থ দশকের রিয়াং কৃষক বিদ্রোহ ও শহিদ রতনমণি'' এবং শ্রী জ্যোতিষ দত্তের লেখা ''ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহ'' এর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেন। তৎপর তিনি তাহাদের প্রবন্ধের মধ্যে যে তথ্যগত অসঙ্গতি আছে তাহারও উল্লেখ করেন। যেমন একজন লেখক লিখেছেন রতন মনি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, অন্যজন লিখেছেন রতনমণি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তৃতীয় জন লিখেছেন রতনমনির পাঁচ মন্ত্রীর মধ্যে একজন রিয়াং রমণী। ঐ তিন লেখকের পরিবেশিত তথ্যের পর মহারাজের খাস সেরেস্তার সংশ্লিষ্ট একটি ফাইলের কিছু নির্বাচিত চিঠি বা তাহার অংশ বিশেষ তিনি প্রকাশ করেন এবং নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহার পরিবেশিত দলিল বা চিঠিগুলি মহারাজের বিদ্রোহ দমনের কার্য্যাবলির সাক্ষ্য প্রদান করে, কিন্তু রিয়াংদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এবং রতন মনির অবদানের বিষয়ে পরিপূর্ণ চিত্র এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যে প্রকাশ পায়নি। মণিময়বাবু বির্তকের নিরসন বিভ্রান্তির অবসানের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাহার প্রবন্ধে, তাহাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে রিয়াং বিদ্রোহের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে। ১৩৭৯বাং সনের উদিতির বিশেষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীজ্যোতিষ দত্তের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের শেষে সম্পাদক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয় মন্তব্য করেন ''রতনমণি পরিচালিত রিয়াং বিদ্রোহ সম্পর্কে দ্বিমত

আছে, অনেকে বিদ্রোহকে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত প্রজাগণের মুক্তি আন্দোলন বলে অভিহিত করেন এবং কোন কোন রাজ্য কংগ্রেস নেতা রতনমনিকে তাম্রপত্র (মরণোত্তর) দেবার দাবী জানিয়েছেন।''

১৯৭২ইং সনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য পেনসন প্রথা চালু হলে রাজনৈতিক মহল বিশেষভাবে রাজপ্রসাদ চৌধুরী, ভূতপূর্ব উপজাতি দপ্তরের মন্ত্রী, দাবী করেন রতনমণির স্বদেশী দলের দন্ডপ্রাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ রিয়াংগণও স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনসন পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু রিয়াং আন্দোলনের কোন স্বীকৃত ইতিহাস নাই। বিমান বাবুর প্রবন্ধ পাঠে রতণমণির সঙ্গে তৎকালীন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতাদের যোগাযোগের আভাষ পাওয়া যায়। অন্যদিকে শ্রীহরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণের (যিনি সেকালে ২য় লেফ্‌টেনেন্ট ছিলেন এবং রাজাদেশে বিদ্রোহ দমনে অংশ নিয়েছিলেন) লেখা ''ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহ ও রতনমণির আন্দোলন'' প্রবন্ধটি রবিবারের বসুমতিতে ১১-১১-৭৩ এবং ১৮-১১-৭৩ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে কংগ্রেসের নেতার সঙ্গে সঙ্গে রতনমণির যোগাযোগের উল্লেখ আছে।

১৯৪৩ ইং সনে জুলাই মাসে বিশ্বযুদ্ধের সংকটময় মুহুর্তে যোদ্ধউদ্দমে সাহায্য কারী ত্রিপুরাধীষকে রাজকীয় সৈন্য প্রেরণ করে, রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং আন্দোলন দমন করতে হয়েছিল। এই রতন মণির সংগঠন শক্তি এবং যুদ্ধ প্রচেষ্ঠায় অসহযোগীতা ও বাধা দেওয়ার নানা প্রকার মুখরোচক কাহিনী ১৯৪৫-৪৬ সনে শুনে প্রকৃত তথ্য জানার আগ্রহ আমার হয়েছিল। সেই সময় অনেকেই রতনমণির আন্দোলনের সঙ্গে আজাদহিন্দ বাহিনীর যোগাযোগের বক্তব্য রেখেছিল। ১৯৪৬- ৪৭ ইং সনে রতনমণির শিষ্যদের সঙ্গে রিয়াং অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালে আমার সেই ধারণার পরিবর্তন হয় কিন্তু বিস্তারিত বিশেষ নুতন তথ্য জানতে পারিনি। সেকালে তারা ''স্বদেশী দল'' নামে পরিচিত ছিল। কেন তাদেরকে 'স্বদেশী' দল বলা হয় এবং ভারতছাড় আন্দোলনের সঙ্গে তাহাদের কোন যোগাযোগ আছে কিনা সে বিষয়ে কোন প্রামানিক তথ্য জানতে পারি নাই যদিও কৌতুহল ছিল প্রবল। অন্যদিকে সরকারীমহলের বক্তব্য ছিল রতনমণি জাপানের চর।১৯৭২-৭৩ সনে রতন মণি ও রিয়াং আন্দোলনের প্রতি শিক্ষিত জনগণের কৌতুহল বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তিন চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হল। উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করা ছাড়াও আমি ত্রিপুর সেনের

Tripura in transetion বইখানা আবার সংগ্রহ করে পাঠ করলাম। এতপর শ্রী দীনেশ দাশ অবসরপ্রাপ্ত ইনস্‌পেক্টার ও ভূতপূর্ব উদয়পুর থানার নায়েব দারোগার সঙ্গে ও সাক্ষাৎ করি। ১৯৪৩ সনে তুইনানীতে অনুসন্ধান কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময় রতন মণির শিষ্যগণ তাকে বন্দী করে দুদিন আটক রেখেছিল। দীনেশ বাবুর বক্তব্য শুনে, বিবৃতি আমি লিখে তার নিকট সংশোধনের জন্য দেই। তিনি আমার লেখা সংশোধনের পরিবর্তে নূতন করে বিবৃতি লিখে দেন। আগরতলা যাত্রা এবং মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অংশটি বাদ দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যদিও আজ তিনি ধন্যবাদের উর্দ্ধে তথাপি তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রতনমণির শিষ্যদের বক্তব্য সংগ্রহ করার জন্য কাঁঠালিয়া ছড়া(বগাফা) গিয়ে ৫/৬ দিন অবস্থান করে বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য নোট করি এবং ক্ষেত্রবিশেষে টেপ রেকর্ড গ্রহণ করি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য দশদা, কাঞ্চনপুর যাওয়া সম্ভব না হলেও সেখান কার নেতৃস্থানীয়গণ আগরতলায় উপস্থিত হলে, কাঠালিয়াছড়ায় প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে নেই। এদিকে আগরতলায় রিয়াং সমাজে অশান্ততার কারণ নিরূপণ কমিটির সদস্য জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মণ (ভূতপূর্ব উপদেষ্টা), নন্দলাল দেববর্মণ, ত্রিপুরা সরকারের অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীর সাক্ষাৎকার কয়েকবার গ্রহণ করি, তদ্‌ অতিরিক্ত মনোরঞ্জন দেববর্মণ (অবসর প্রাপ্ত বিশিষ্ট রাজকর্মচারী এবং তৎকালীন রাজ্যরক্ষী বাহিনীর অফিসর) উদয়পুরের তৎকালীন এস ডি ও এবং অঘোর দেববর্মার সাক্ষাৎকার ও গ্রহণ করি। অঘোরবাবু ছাড়া অন্যরা সবাই লোকান্তরিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং অঘোরবাবুকে ধন্যবাদ জানাই।

মনিময়বাবু তার প্রবন্ধের শেষে লিখেছেন''আরো কতক সরকারী নথীপত্র যাহা আছে আপাতত তাহা কাজে লাগিতেছেনা।''আমি লক্ষ্য করেছি চিঠিগুলি তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেননি। তার দৃষ্টিতে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেগুলিই তিনি প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয়েছিল চিঠির উত্তর প্রত্যুত্তর গুলি পরপর তুলে ধরলে ঘটনার চিত্রটি আপনি পরিস্ফুট হত। চিঠিগুলি তার নিকট হতে ধারে পাওয়ার আবেদন করেছিলাম। তিনি তৎপরিবর্ত্তে তার বাটিতে গিয়ে দলিলগুলি পাঠ করার সাদর আমন্ত্রন করেছিলেন। নানা কারণে আমার পক্ষে দুই তিন দিন চেষ্টা করার পর, আর তাঁর বাটিতে গিয়ে অবশিষ্ট চিঠিপাঠ করা সম্ভব হয়নি।

তিনি দৈনিক সংবাদে যেভাবে পরপর সরকারী ফাইলের চিঠিগুলি ব্যবহার করেছেন সেইভাবেই চিঠিগুলির নম্বর দিয়ে প্রবন্ধের শেষে সংযোজন করা হয়েছে। মনিময় প্রকাশিত চিঠিগুলির মধ্যে কয়েকটি চিঠির রিয়াং আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই মনে করে পুনরায় ছাপান হয়নি।

মনিময় বাবু এই মূল্যবান ফাইলটি জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মার নিকট হতে সংগ্রহ করেছিলেন প্রবন্ধ লেখার জন্য। মনিময় বাবুর প্রবন্ধটি ঐসব মূল্যবান দলিল সহ প্রকাশিত না হলে আমার পক্ষে রিয়াং বিদ্রোহের রূপরেখা প্রকাশ করা সম্ভব হতনা। মনিময় বাবু প্রবন্ধই আমাকে রতনমনি ও রিয়াং বিদ্রোহ লেখায় উৎসাহিত ও প্রেরণ দান করেছে। মনিময় বাবু এবং শ্রদ্ধেয় জিতেন ঠাকুর আজ আর ইহ জগতে নেই। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ত্রিপুর সেনের ত্রিপুরা ইন ট্রেনজিশন এবং জ্যোতিষ দত্ত ও হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণ- এর পরিবেশিত তথ্য থেকে আমি অংশ বিশেষ গ্রহণ করেছি এবং পাঠে উপকৃত হয়েছি। ত্রিপুর সেন এবং হরেন্দ্র কিশোর পরপারে। তাদেরকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং জ্যোতিষ দত্তকে জানাই ধন্যবাদ।

আমার সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে যেসব বাস্তবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ মনে হয়েছে এবং অধিকাংশের বক্তব্যে সমর্থিত হয়েছে সেই গুলিই আমি প্রবন্ধে সংক্ষেপে পরিবেশন করেছি। রিয়াং বিদ্রোহের পটভূমির ধারাবাহিক পরিপূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটন করা নানা কারনে আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিভাবে কখন থেকে রায় কাঞ্চন দেবী সিং রিয়াং চৌধুরী ও তার সভাসদদের সঙ্গে নবশিক্ষায় শিক্ষিত খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরী (পরবর্তী রায় কাঞ্চন) ও তাঁর সমর্থকদের মনোমালিন্য ও সংঘাত আরম্ভ হল, সেই বিস্মৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায়নি। সঠিক কোন সময়ে মহারাজ খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরীকে রায় কাঞ্চন (রিয়াংদের রাজা) মনোনীত করেন জানা যায়নি। জিতেন ঠাকুর,নন্দলাল দেববর্মা এবং রতন মনির প্রধান শিষ্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় রাজ্যরক্ষী বাহিনী গঠন করার দায়িত্বে থাকাকালেই খগেন্দ্র চৌধুরী রায় কাঞ্চন নিযুক্ত হয়েছিলেন অর্থাৎ ১৯৪০-৪২ সনে। জ্যোতিষ দত্তের প্রবন্ধেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।রতনমনির শিষ্যদের একটি প্রধান অভিযোগ ছিল যে মহারাজ রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে রায় জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্য রায় নিযুক্ত করেছেন। এই বক্তব্যও প্রমাণ করে যে ১৯৪৩ সনে আন্দোলন

দমন করার বহু পূর্ব থেকেই খগেন্দ্র চৌধুরী 'রাই' বা রায় কাঞ্চন নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরীকে রায় নিযুক্ত করার আদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হয় ১৯৫৩ ত্রিং (১৯৪৩ইং) এর ১৭ই কার্তিক (গোমতি মাঘ ১৩৯৭) ।

রতনমনির বিষয়ে প্রধানশিষ্যদের নিকট হতে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি সাধারন লেখাপড়া জানতেন এর বেশী কোন তথ্য পায়নি। রাজনীতির সংগে রতনমনির কোন যোগ ছিল বলে কোন সাক্ষ্যপ্রমান ১৯৪৫-৪৭ সনেও পাইনি এবং ১৯৭৩-৭৪ সনে অনুসন্ধান কালেও পাইনি। কমরেড অঘোর দেববর্মা ও বলেছেন ক্যমুনিষ্ট বা অন্যকোন রাজনৈতিক মতবাদের সংগে রতনমনি যুক্ত ছিলেন না। রতনমনির একজন প্রধানশিষ্য রাজপ্রসাদ রিয়াং চৌধুরী ভূতপূর্ব মন্ত্রী (তস্লমফা) ১৯৭২-৭৩ সনে, রতনমণির আন্দোলনের সংগে কংগ্রেস নেতার যোগাযোগ ছিল বলে দাবী করেছিলেন। ১৯৪৫-৪৭ সনে এমন বক্তব্য তিনি আমার নিকট রাখেননি। আমার ধারণা হয় বয়সের জন্য ১৯৪৫-৪৬ সনের ঘটনার সংগে ১৯৪৩ সনের ঘটনা কে তিনি জড়িয়ে ফেলে ছিলেন। বগাফার কাঠালিয়ায় তথ্য সংগ্রহ কালে, তসলমফা সহ রতনমণির প্রধান শিষ্যগণ আমাকে নানাভাবে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছিল এবং থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্তও করেছিল। তাদের সকলকে এই সুযোগে আমার ধন্যবাদ জানাই। তসলমফা কয়েকবৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেছেন। তার আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ত্রিপুরা সরকারের ট্রাইবেল রিসার্চ বিভাগ অগ্রণী হয়ে আমার লেখা''রতন মণি ও রিয়াং বিদ্রোহ'' ''রিয়াং বিদ্রোহে খুসী কৃষ্ণের গানের প্রভাব ও গান'' এবং ''শোধবোধ'' পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। চল্লিশের দশকের রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াংদের নবজাগরণের প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণ চিত্রটি ঐতিহাসিক মর্যাদা পাওয়ার জন্যই আমি আনন্দিত। ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের মহতী প্রচেষ্টাকে খর্ব করিতে চাইনা।

পুনরাবৃত্তি পরিহার করার জন্য 'রিয়াং বিদ্রোহে খুসী কৃষ্ণের গানের প্রভাব ও গান' প্রবন্ধটি নূতনভাবে লিখে 'খুসী কৃষ্ণের গান ও বিদ্রোহে তার প্রভাব' নাম দেওয়া হয়েছে। খুসী কৃষ্ণ নোয়াতিয়ার প্রকাশিত গানগুলি তাহার দেওয়া নাম 'ত্রিপুরা রাচামং খুম্বার বাই' নামই দেওয়া হল এবং পাশে বাংলা তর্জমা দেওয়া হল। আরও সংযোজন করে 'শোধবোধের নাম' মুক্তারাম রাখা হল।

ইতি

তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।
১২/১২/৯১

রতনমণি ও রিয়াং বিদ্রোহ

বিদ্রোহীদের আস্তানায়

উদয়পুর থানার দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত নায়েব দারোগা শ্রীদীনেশচন্দ্র দাশ ও তাঁর সঙ্গীদের বে-আইনী আটক, রতনমণির আন্দোলনকে নাটকের তৃতীয়াঙ্কে পৌঁছে দেয়। শ্রীদাশ মহাশয়ের (অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর) বক্তব্য দিয়েই আরম্ভ করা যাক। তিনি বলেন, ''আজ অনেকদিন হয়ে গেছে, সন- তারিখ আমার মনে নেই। রতনমণি সাধুর সংগে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাৎ ও দ্বিতীয় সাক্ষাতে সময়ে ব্যবধান কয়েক বছর। প্রথম সাক্ষাৎ হয় আগরতলার কোতোয়ালী থানায়। একরাতে তাঁকে থানায় আটক করা হয়। পরদিন ভোরে রাজদরবারে বিনন্দিয়া গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভোরবেলা থানায় কাজে যোগ দিতে গিয়ে তাকে দেখি। বিশেষত্ব কিছুই দেখিনি। কৃষ্ণকায়। উচ্চতা সাধারণ। দাড়ি গোঁফ নেই। সেদিন আমিও বিশেষভাবে তাঁকে লক্ষ্য করিনি। আর দশজন আদিবাসীরই মতো একজন মনে হয়েছিল। শুনেছি তিনি সেই গারদ থেকে পরদিন পালিয়ে যান। বিনন্দিয়া গারদ থেকে পালাবার কাজে ভ্রমর দেববর্মা বলে রতনমণির এক ভক্ত তাঁকে সাহায্য করেছিল বলে শুনেছিলাম। এসময় শ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্ব কাল ছিল।

আমি যখন উদয়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তখন মাসাধিককাল থেকে শুনতে পাই যে রতনমণির দল, পাহাড়ে খগেন্দ্র রায়ের (রিয়াং 'রায় কাঞ্চন' বাড়ী বগাফা, বিলোনীয়া , রাজ্য সরকার থেকে রিয়াং সম্প্রদায়ের নির্বাচিত নেতা) দলের লোকের উপর অত্যাচার করছে। ধনসম্পত্তি, হাঁস মোরগ, ছাগল, গরু, মহিষ , লুটপাট করে নিচ্ছে এবং লোকজনও ধরে নিয়ে যাচ্ছে এবং ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা পাহাড়ে উদয়পুর, অমরপুর ও বিলোনীয়া বিভাগ নিয়ে কয়েকটি কেম্প করেছে এবং রসদ

যোগাড় করছে। তারা মাঠের ধান দলবদ্ধভাবে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অনুমান ১৫ দিন আগে বিশেষভাবে ব্যবসায়ীদের মুখে শুনি যে রতনমণির দলের প্রস্তুতি শেষ হলে উদয়পুর, অমরপুর ও বিলোনীয়া টাউন আক্রমণ করবে। খগেন্দ্র রায়ের লোক মহকুমা হাকিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন জানতে পারি। উদয়পুর টাউনেও লোকজন একটু ভয়ে ঘাবড়িয়ে গিয়েছে বুঝতে পারি। এ সময়ের সন তারিখ আমার মনে নেই, তবে শ্রাবণ মাস ছিল অর্থাৎ ইংরেজী জুলাই মাসের শেষ বা আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগ হবে বলে মনেহয়। উদয়পুরের উপরোক্ত খগেন্দ্র রায়ের দলের নেতৃস্থানীয় রাজপ্রসাদ চৌধুরী, কুমারিয়া ওঝাই প্রভৃতি ও অমরপুরের শ্রী তীর্থরায় চৌধুরী প্রভৃতি। রতনমণির দল ব্যাপকভাবে বিলোনীয়া, উদয়পুর, ও অমরপুর বিভাগে রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা খগেন্দ্র রায় ও তার দলের কথায় চলাফেরা করে, তাদেরই উপর হামলা চালাচ্ছে।

এ সময়ে একদিন বিকাল বেলা আমি একটি তদন্ত কার্য শেষ করে থানায় ফিরে আসার পর থানার ও,সি. শ্রীমিহিরচন্দ্র চৌধুরী আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে বলেন যে, তিনি অসুস্থ। দক্ষিণ মহারাণী মৌজার শ্রীগঙ্গারাম রিয়াং লিখিতভাবে উদয়পুর কোর্টের মাননীয় শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সদনে উপরে কথিত বিবরণ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করলে এ অভিযোগ তদন্তক্রমে সত্বর রিপোর্ট দেয়ার জন্য থানায় পাঠিয়ে ছিলেন। এই অভিযোগ বেশ কিছুদিন পূর্বেই থানায় এসেছে। তিনি নিজে তদন্তে যাবেন বলে তাঁর ফাইলে রেখেছিলেন। তিনি যেতে পারবেন না বলে আমাকে আগামী কালই এই মোকদ্দমার তদন্তে যেতে বলেন। অভিযোগ গুরুতর, তাই আর বিলম্ব না করে যেতে বলেন ও অভিযোগটি আমাকে দিয়েছিলেন।

পরদিন সকালে আমি থানার কনেষ্টবল শরৎ দাস, বিধু মজুমদার সহ এই মোকদ্দমার তদন্তে রওয়ান হই। আমার সঙ্গে শাদী গঙ্গারাম রিয়াং ও এখানকার রাজপ্রসাদ চৌধুরী ও আরো ২/১ জন আদিবাসী রওয়ানা হয়। আমার বিছানা ও খাওয়ার জন্য চাল ডাল ইত্যাদি নেওয়ার জন্য, নাম মনে নেই, একজন নোয়াতীয়াকে দিন মজুর হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যার সময় আমরা ব্রহ্মছড়ার কুমারিয়া ওঝার বাড়ীতে পৌঁছি ও এক রাত ওখানেই থাকি। পরদিন সকালে এবাড়ী থেকে রওয়ানা হই। ঐ সময় ঐ বাড়ী থেকে কুমারীয়া ওঝা ও আরো ১০/১১ জন আদিবাসী আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হয়। আমরা ব্রহ্মছড়া পৌছবার পর হতেই চর্তুদিকে ঘন ঘন মহিষের শিং এর তৈরী শিঙ্গার আওয়াজ শুনতে পাই। রওয়ানা

হওয়ার সময়ই এ আওয়াজ হতে থাকে। এ শব্দ রতনমণির দলের লোকের সাংকেতিক খবরাখবর বলে জানতে পারি। পথে যাবার সময় কয়েকটা পোড়াবাড়ী দেখতে পাই। মাঠে বহুলোক ধান কাটছে দেখতে পাই। তাঁরা রতনমণির দলের লোক বলে জানতে পারি ও তারা আমাদের দেখে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এ সময় জানতে পারি যে রতনমণির দল এদিকে তুইনানী ও অমরপুর এলাকায় তুইছারুবুহা নামক স্থানে দুটো বড় ঘাঁটি তৈরী করেছে। এ দু'কেম্পে অনুমান ১০/১২ হাজার লোক থাকে। লুটপাটের মালামাল, গরু,মহিষ ইত্যাদি দু'কেম্পে নিয়ে যায়। কেম্পে ধান চাউলের গোলাও প্রস্তুত করেছে। ধান চাল গোলায় মজুদ করছে। কেম্প থেকেই রাতে লুটপাট করার জন্য রওয়ানা হয় তুইছারুবুহা কেম্পই তাদের কেন্দ্রস্থল।

অল্পবেলা থাকতে আমরা বাদী গঙ্গারাম রিয়াং এর বাড়ী পৌছি। এ বাড়ীটা তুইনানী কেম্পের পশ্চিম দিকে অনুমান ২ ফালং দূরে। এ বাড়ীতে কোন লোকজন বা কোন জিনিষ নেই। খালিঘর মাত্র। কাছে কোন বাড়ী নেই। এখানে পৌছার পরক্ষণই স্থানীয় ২/৪ জন আদিবাসী আমার কাছে আসে এবং এখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বলে। কারণ আমাদেরও বন্দী করবে। আমার সঙ্গীরা সকলে ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। সকলেই আতঙ্কগ্রস্থ। আমি ঐ কথায় কর্ণপাত না করে আমার সঙ্গের কনেষ্টবল দুজনকে তুইনানী কেম্পের সর্দারকে মোকদ্দমার খবর জানাতে ও তদন্ত কার্যের সুবিধার জন্য উপস্থিত থাকারজন্য খবর দিতে পাঠিয়ে দেই।

ঐ সময়ও ঘন ঘন শিঙ্গার আওয়াজ ও তুইনানী কেম্পে বহুলোকের হৈ হল্লা শুনতে পাই। এই বাড়ী ও তুইনানী কেম্পের মধ্যস্থান ধানজমি। তুইনানী কেম্পটা টিলার উপর। এ বাড়ীর সংলগ্ন আর কোন বাড়ী নেই। এখানে বাসনপত্র জমাতিয়া বাড়ী থেকে এনে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত হই এবং পাক(রান্না)ও আরম্ভ করা হয়। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ীয়া ভাষায় কে একজন এখানকার লোকজনকে খবর দেয় যে তাদেরকে ধরে নিতে আসছে এবং পুলিশ দু'জনকে বন্দী করে রেখেছে। সঙ্গী রাজপ্রসাদ চৌধুরী, গঙ্গারাম রিয়াং ও তল্পিবাহক নোয়াতিয়া ব্যতীত অন্য সকলেই অসমাপ্ত রান্না ফেলে দিয়ে তৈজষপত্রসহ পালিয়ে যায়। তারা আমাকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু সঙ্গী দু'জন ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও যাব না বলি।

তখন গঙ্গারাম রিয়াংও অন্যত্র চলে যায়। সন্ধ্যা হয় হয় সময় কনেষ্টবল দু'জন ফিরে আসে এবং আগামীকাল সকালে তারা এখানে আসবে কিম্বা আমাকে তাদের ওখানে নিয়ে যাবে বলে জানায়। এখানে রান্না করার কোন বাসনাদি না থাকায় আমি সঙ্গীয় লোকজনসহ নিরুপায় হয়ে তুইনানী কেম্পের টীলা সংলগ্ন এক জমাতিয়া বাড়ীতে চলে যাই।

কনেষ্টবলদের কাছে জানতে পারি যে তুইনানী কেম্পে অনুমান ২/৩ হাজার লোক আছে। তারা অধিকাংশই সশস্ত্র। কোন মেয়ে ছেলে নাই। বন্দুক, দা, রামদা, খড়গ, তরবারী, বল্লম ইত্যাদি হাতে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। কেম্পের প্রবেশ পথে ছড়ার মুখ হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধাপে ধাপে সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা আছে। কনেষ্টবলদ্বয় যাওয়ায় তাদের ঘেরাও করে রাখে ও অন্যত্র অন্যান্য লোকজন বসে পরামর্শ করে - এই উত্তর দিয়েছে। আমরা যাওয়ার পর জমাতিয়া বাড়ীর একটি ঘরে ঘুমিয়ে থাকি কিন্তু তুইনানী কেম্পের লোকজনের হৈ হল্লায় ঘুম আসে না। রাতের নি:স্তব্ধতার মধ্যে লোকজন চলাফেরা করছে টের পাচ্ছি। ক্রমে আমরা যে বাড়ীতে আছি এ বাড়ীর চতুর্দিকেই লোক ঘুরছে ও ফিস ফিস করে কথাবার্তা বলছে শুনতে পাই। আমিও ফর্সা হয় হয় দেখে ঘরের বাইরে যাই এবং দেখতে পাই যে আমাদের থাকার বাড়ীটা চতুর্দিক দিয়ে বহুলোক ঘেরাও করে রেখেছে এবং কুমারীয়া ওঝাগং কয়েকজনকে পিছমোড়া বেঁধে মারতে মারতে তুইনানী কেম্পের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কোন প্রকার সাহায্য করার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ হাতের লাঠি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নেই। লোকসংখ্যাও মাত্র ৩ জন। কুমারিয়া ওঝা গংকে তুইনানী কেম্পে নিয়ে যাওয়ার পর কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে রাজপ্রসাদ চৌধুরীকে ধরে বেঁধে ফেলে ও মারতে মারতে তুইনানী কেম্পের দিকে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমাদেরকে কেম্পে যেতে বলে। আমি কেম্পে না গিয়ে এখানে বসেই তদন্ত কার্য সম্পন্ন করব বললে, তারা কেম্পে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে বলে। অবস্থা বিবেচনায় এখানে আর অপেক্ষা না করে বিছানাদি এখানেই রেখে পরিধানের কাপড় ও খাবার চাল, ডাল ইত্যাদিসহ তাদের অনুসরণ করি। আমদেরকে কেউই ধরেনি। কেবল নোয়াতিয়া লোকটা কেন সঙ্গে এসেছে বলে সামান্য মারপিট করে।

তুইনানী কেম্পের প্রবেশ পথে স্থানে স্থানে সশস্ত্র বন্দুক ও খড়গসহ পাহাড়াদার দেখতে পাই। কেম্পটা একটি বড় টীলার উপর। বিভিন্ন

অবস্থানে উত্তর দক্ষিণ লম্বালম্বি ১০/১২টা বড় বড় মাটির ও মাচাং ঘর। এখানে এক জায়গায় মহিষ কাটা হচ্ছে। লোকসংখ্যা অনুমান(২০০০) হবে মনে হয়েছে। আমাদিগকে পূবের ভিটার একটি মাটির ঘরের বারান্দায় বসিয়ে আমাদের শরীর তালাস করে ও কনেষ্টবলদের সঙ্গের ঝোলা ও চাল-ডালের টুকরিটির ভেতরও দেখে। আমার সঙ্গে কয়েকটা টাকা ছিল। ঐ টাকার মধ্যে কয়েকটা টাকা নিয়ে যায়(সঠিক সংখ্যা এখন মনে নেই)। এখানকার সকলের গলায়ই একটা রুদ্রাক্ষ সূতা দ্বারা মালার ন্যায় পরা। আমার হাতে একটি রুদ্রাক্ষ ছিল। আমার হাতে রুদ্রাক্ষটি দেখে তারা তাদের ভাষায় কি যেন আলোচনা করেছিল। আমাদের বলে যে তাদের গুরু রতনমণি অমরপুর এলাকায় তুইছারুবুহা কেম্পে আছে। আমাদের সেখানে নিয়ে যাবে।

অনুমান একঘন্টা পর আমাদের নিয়ে তুইছারুবুহা রওয়ানা হয়। তুইছারুবুহা এস্থান হতে অনুমান ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বকোণে। বর্তমান কালের জীপ চলাচলের মত কোদাল চালিয়ে পরিস্কার করে রাস্তা করা হয়েছে। ছড়াগুলিতে কোন পুল নেই। প্রত্যেকটি ছড়ার ধারে ছোট ছোট ঘর করে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদিগকে মধ্য পথে এরূপ একটি কেম্পে বিশ্রাম করিতে বলে চিনার, আনারস ও পেঁপে খেতে দেয়। আমরা এখানে কতক্ষণ বিশ্রাম করে তুইছারবুহা রওয়ান হই। আমাদের সঙ্গের পাহারাদার(বন্দুকধারী) একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, আমাদিগকে রতনমণির কাছে উপস্থিত করবে। তিনি আমাদের বিচার করবেন। সে আমাদেরকে আরো বলে যে, আমরা যেন কেহ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে এবং পথিমধ্যে ও কেম্পে পৌঁছে সকলকেই 'জয়গুরু' বলে সম্বোধন করি। তাহলে সকলেই সম্মান করবে। এই লোকটি খুব কোমল স্বভাবের। আমাদের সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে। সে আরো বলে যে আমাদেরকে প্রথমে মন্ত্রীসভার ঘরে নেবে। সেখানে যেন কিছু নজরের টাকা দেই। সে বলে যে মন্ত্রীর সংখ্যা পাঁচ। নামও বলেছিল। তন্মধ্যে চিত্র সেন ও রাম বাহাদুরের নাম মনে আছে। অন্যদের নাম মনে নেই। রতনমণির ভাই চিন্তমণিও আছে। তিনি খুব ভালো মানুষ। সরকারের মতই তাঁদের বিভিন্ন দপ্তর আছে। শ্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী ওরফে তছলামফা, ত্রিপুরার ভূতপূর্ব আদিবাসী মন্ত্রী, সম্ভবত: রতনমণির মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী বা কোষাধ্যক্ষ। প্রধান সেনাপতি শক্তিরায় রিয়াং।

আমরা অনুমান দু'টার সময় তুইছারুবুহা কেম্পে পৌঁছেছিলাম। সেখানে

আমাদেরকে প্রথমে মন্ত্রীসভার ঘরে নিয়ে যায়। এঘরটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। খুব বড় মাটির ঘর। মধ্যস্থলে উঁচু বেদীতে ফরাস পাতা, মন্ত্রীদের আসন দামী কাপড় দিয়ে মোড়ান ও পাঁচজনের পাঁচটি তাকিয়া, সম্মুখ পশ্চিম দিকে। ঘরে চেয়ার বা অন্যকোন আসন নেই। পূর্বদিকে মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের একখানা বাঁধানো ফটো বাঁশের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। মন্ত্রীদের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ও মাথায় সিল্কের পাগড়ী। কাঁধে সিল্কের আচকান। সঙ্গে তরবারি আছে। এ ঘরটির উত্তর অংশে বাঁশের বেড়া দিয়ে কয়েদখানা করা হয়েছে। এ কয়েদখানায় বন্দী রাজপ্রসাদ চৌধুরী রয়েছে। এখানে মন্ত্রীর আসনে মহারাজা ফটোর নীচে নজর দিতে বললে দু'টাকা নজর দিয়ে প্রণাম করি। তৎপর আমাদিগকে ঐ ঘরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি ঘরে নিয়ে যায়। আমার দলের কনেষ্টবল ও নোয়াতিয়াকে পাক করে খেতে বলে, রান্নার জন্য লাকড়ি ও কড়াই ইত্যাদি এনে দেয় এবং কয়েকজন আমাদের পাহারায় থাকে। ঐ সময়ে পাহারাদার রতনমণির ভাই চিন্তামণিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিল। কয়েদখানার কাছে একটি বাদ্যঘন্টা লটকান আছে। আমরা যখন পাক করে খেতে ছিলাম এ সময় দেখতে পাই অনেক লোক লুটের মালপত্র - গরু, মহিষ, পাঠা, ছাগল ও হাঁস, মোরগী সহ এসে পৌঁচেছে। মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সকলেই পাগড়ী খুলে বাবরি চুল খুলে ফুল ও কমন্ডুল হাতে নিয়ে ছড়ায় নেমে স্নান ও পূজা করেছে দেখতে পাই।

তুইছারুবুহা ক্যাম্পটি একটি ছড়ার দুই পাড়ে, পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। এ স্থানে অনেকগুলি লম্বা লম্বা বড় বড় মাচাং ঘর। ঘরগুলি দুই সারিতে, এক সারি পূর্বদিকে অপরটি পেছন দিকে, পশ্চিম দিকের কোন ঘর যে কি কাজে ব্যবহার হচ্ছে বুঝতে পারিনি। এ টিলাটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। এই টিলার উত্তর দিকে মন্ত্রীর আসন ঘর হতে উত্তর দিকে টিলার শেষ মাথার উঁচুতে রতনমণির থাকার ঘর। টীলাটি খুব প্রশস্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে বাঁশ দ্বারা বেড়া দিয়ে পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। কোন কোন ঘর শস্য ভান্ডার। কোনটি লুটের অন্যান্য মালপত্র রাখার। কয়েকটি কর্মীদের থাকার ঘর বলেও মনে হয়েছিল। আমাদের চলাফেরার স্বাধীনতা না থাকায় সমস্ত ঘরগুলোর ভেতরের অবস্থা দেখতে পারিনি। এখানে অনুমান সাত - আট হাজার লোক ছিল।

খাবার পর জানতে পারি যে রতনমণির সংগে দেখা করার সময় সকাল ৮টা থেকে ১১টা ও বিকেল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অন্য সময় দেখা

করার সুবিধা নেই। ৮টা ও ৪টার সময় ঘন্টা বাজানো হয়। ঘন্টা বাজলে দেখা করার সময় বুঝতে হবে। কখন কে দেখা করবে মন্ত্রীসভা ঠিক করে দেবে। আমার সঙ্গীয় নোয়াতিয়া আমাকে জানায় যে আজ আমাকে দেখা করতে দেবে না - সে সেখানকার লোকের কথা বার্তায় জানতে পেরেছে। এ কথা শুনে আমি বড়ই চিন্তিত হয়ে পরি এবং চিন্তামণির খোঁজ নিয়ে তাকে পেয়ে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি কি করতে পারেন দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়ে চলে যান। এদিকে আমি বড়ই অসহায় অবস্থায় চিন্তামণির অপেক্ষায় থাকি। অনেক সময় পর চিন্তামণি এসে বলে যে অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমার দেখা করার ব্যবস্থা সে করেছে। পাহারাদার আমাকে আমার সঙ্গের কনষ্টেবল সহ রতনমণির ঘরের দিকে নিয়ে যায়। পাহারাদার বলে যে মাঝপথে গেইটে পাহারাদার আছে, সে জিজ্ঞাসা করলে গুরুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি যেন বলি। আমিও তার কথামত কাজ করে রতনমণির ঘরে পৌঁছেছিলাম।

রতনমণির ঘরে পৌঁছে যথারীতি 'জয়গুরু' বলে সম্বোধন ও নমস্কার করলে তিনিও প্রতি নমস্কার করেন। তিনি আমাকে তাঁর সন্মুখে বসার ব্যবস্থা করেন। ঘরে বসার কোন আসবাব নেই। ঘরটি মাচাং ঘর। সবাই ফরাস এবং চাটাইয়ের উপর বসেছিল। এই সময় এ স্থানে পাঁচ মন্ত্রী ও দরবারের অন্যান্যরা সকলেই উপস্থিত ছিল। রাজপ্রসাদ চৌধুরী ওরফে তছলমফাও আছেন দেখতে পেয়েছিলাম। রতনমণি আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি গঙ্গারাম রিয়াং যে অভিযোগ করেছে তার তদন্তে এসেছি বল্লে, তিনি দরখাস্তটি পড়ে শুনাতে বলেন। আমি দরখাস্তখানা পড়ে শুনালে তিনি (রতনমণি) বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বলার ভংগিতে কোন ক্রোধ ছিল না। মধুর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য ও উদারতা নিয়ে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ এই: আদিবাসীর মধ্যে রিয়াং সম্প্রদায় অত্যন্ত নিরীহ ও বোকা প্রকৃতির। ধর্ম সম্বন্ধে অর্থাৎ ভগবান যে আছেন এই জ্ঞান তাদের নেই। এই অবস্থা দেখে তিনি রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবান বা ধর্মজ্ঞান যাতে হয়, তার জন্য নাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এ পর্য্যন্ত বহুলোক নাম নিয়েছে এবং ক্রমেই ধর্ম পিপাসা দেখা দিচ্ছে। এ নিয়ে রাজ দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক নালিশ গেছে। নাম নেয়ার বা দেয়ার কার্য হতে বিরত হইনি বা রিয়াংরাও হয়নি। এই কারণে খগেন্দ্র এবং তার সমর্থক চৌধুরীরা তার শিষ্যদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার করছে। তার শিষ্যদের কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা জরিমানা

আদায় করেছে। তিনি তাদের ডেকে এনে জানতে চান যে, এ'টাকা দিয়ে খগেন্দ্র রায় গন কি করেছেন? রিয়াং সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য এ' অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিনা? যদি না করে থাকেন তাহলে এ অর্থ দিয়ে কি করেছেন? ভগবান দরিদ্রের বন্ধু। গরীবকে রক্ষা করাই ধর্ম। ভগবান অন্যায় সহ্য করেন না। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ হতেও অনেক দৃষ্টান্ত দেখান। তিনি আক্রোশ মূলে চৌধুরীগণকে ডাকাবার চিন্তা করেননি।অনুমান দেড়ঘন্টা এ ঘরে বসে আলোচনা হয়। তিনি তথায় উপস্থিত থেকে তাঁর লোকগণকেও অযথা যেন কাউকে হয়রানি না করা হয় সে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আমার তদন্ত কার্য শেষ হওয়ায় আমি যাতে আজ ফিরে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করার কথা ও এখানে বিলম্ব না করে এখনই ফিরে যাওয়া একান্ত আবশ্যক বলে ব্যক্ত করি। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আগামী কাল ভোরেই যাতে আমি রওয়ানা হয়ে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে উপস্থিত লোকগণকে রতনমণি আদেশ করলেন। আরো বল্লেন যে, আমার খাওয়া থাকার যেন সুব্যবস্থা করা হয়। এ ঘরটি অনুমান ১২/১৩ হাত লম্বা। ৭/৮ হাত পাশ। মাচাং ঘর। পূর্বদিকে উত্তর কোণায় একটি মাত্র দরজা। ঘরের ভেতরে বেড়ার সঙ্গে বাঁশ দিয়ে রেক বানিয়ে বিভিন্ন প্রকারের ফল রেখেছে। আপেল, বাদাম, কিচমিচ ইত্যাদিও আছে। আমাকে কিছু ফল দিয়ে বল্লেন যে আমি যেন এই ফল আমাব ছেলে মেয়েদের জন্য নিয়ে যাই। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম। মহারাজা বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন কথাই আমার সামনে বলেন নি। তাঁকে প্রকৃত সাধু বলেই সেদিন আমার মনে হয়েছিল।

ঘর হতে শ্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী ওরফে তছলমফা, চিন্তামণি ও আরো ২/৩ জন সহ আমরা বের হয়ে এলে তারা আমাদের জিনিষপত্র সহ আমাদিগকে ছড়ার পূর্ব পাড়ে একটি ঘরে নিয়ে আসে। এখানে ৩/৪টি মাচাং ঘর আছে। কিন্তু ঘরগুলি এমনভাবে তৈরী করেছে যাতে ঘরগুলির ভেতর বা বারান্দা কোন জায়গা থেকেই পশ্চিম পাড়ের কিছুই দেখা না যায়। এখানে একটি ঘরের বারান্দায় আমরা সকলে বসলে এখানে ফল দেওয়া হয়। এখানে সকলেই গঞ্জিকা সেবী। এখানেও গাঁজা খাওয়া আরম্ভ হল। নানা কথাবার্তা চলতে থাকে। তারা নেশায় আসক্ত হলে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানবার উৎসাহে আমি ও তাদের সঙ্গে কল্কিতে ২/১ টান দিতে থাকি। কিন্তু মূল রহস্যের কিছুই জানতে পারিনি। আমাদের

বিছানাপত্র তুইনানী কেম্পের কাছে জমাতিয়ার বাড়ীতে রয়েছে। রাত্রি অনুমান সাড়ে সাতটার সময় বিছানা নিয়ে এখানে বাহকগণ এলে পর তারা ১৬ জন লোককে আমাদের থাকার ঘরে বারান্দায় রেখে, পাকের ব্যবস্থা করে দিয়ে সকলেই চলে যায়। যাওয়ার সময় বলে গেল যে বাইরে যেতে হলে পাহারাদারদিগকে যেন সঙ্গে নিয়ে যাই। নতুবা বন্দুকের গুলিতে মারা যেতে পারি। আমরা আশ্চর্য হলাম, যে রাস্তা আমরা এক দুপুরে অতিক্রম করেছি ঐ রাস্তা এত অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে কি ভাবে বিছানাদি নিয়ে এলো। এতে মনে হয় তাদের সংবাদ আদান প্রদানের জন্য শিঙ্গার সাহায্যে রিলে করার অভ্যাস আছে। এই কেম্পে শিঙ্গা বাজালে দূর হতে প্রত্যুত্তর আসে।

ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীয় নোয়াতিয়া লোকটা আমাকে জানায় যে আমরা রতনমণির কাছে চলে গেলে পর এখানের লোকের আলাপে জানতে পেরেছে আমাদেরকে যেতে দেবে না। প্রাণে মেরে ফেলবে। যদি গুরু (রতনমণি) যাওয়ার আদেশও দেয় তা হলে বর্তমান সীমানার বাইরে গেলে পর যাওয়ার সময় সুবিধা মতো কেটে ফেলবে। আমাদের ভাবনার শেষ নেই। সময় সময় পাহারাদারদের সঙ্গেও কথা বলতে থাকি। তারাও গঞ্জিকা সেবনে অভ্যস্ত। তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ প্রকাশ করার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের ভেতরের কথা জানার জন্য তাদের সঙ্গী হই। কিন্তু কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি।

রাত্রি অনুমান ৮.৩০ মিনিট কি ৯টার সময় আমার সঙ্গীয় বিধু মজুমদার কনেষ্টবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পাহারাদার ৪ জন সহ ছড়ার ভেতরে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে জানায় অপর পাড়ের কেম্পে হাজার হাজার লোক মশাল জ্বেলে বন্দুক, খড়গ ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে দলে দলে কোথায় যেন যাচ্ছে। দু:শ্চিন্তাগ্রস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকি। গভীর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যেও অপর পাড়ে কর্ম ব্যস্ততার আওয়াজ পাই। অনিদ্রার মধ্য দিয়েই রাত্রি শেষ হয়।

অবশেষে এখানকার দু'জন পাহারাদারসহ আমার সঙ্গীয় দু'জন কনেষ্টবল ও তল্পীবাহক নোয়াতিয়াসহ রওয়ানা হই। অনুমান ৩ মাইল রাস্তা যাওয়ার পর পথে শক্তিরায় তার দলসহ আসছে দেখতে পাই। শক্তি রায় আবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমার সঙ্গীয় কনেষ্টবল দু'জনকে খুব মারধর করে। মারের চোটে শরৎ দাস কনেষ্টবলের চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমাকেও পায়ে দু'বার আঘাত করে। কেম্পে এনে আমাকে চিন্তামণির

হেফাজতে রেখে শক্তি রায় মন্ত্রীদের ঘরে চলে যায়। চিন্তামণি তখন আমাকে বলে যে এ জন্যই দুপুরের পর যেতে বলেছিলাম। তাদের দলের অনেক লোক এখনো বাইরে রয়েছে। এ লোক ফিরে না আসা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। শক্তি রায় মন্ত্রীদের ঘরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে যে কেন আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল এবং কে আদেশ দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে শক্তি রায় আমাদেরকে দুপুরের পর যেতে বলে। অনুমান ১ ঘন্টা পর শক্তি রায়ের অনুমতি নিয়ে আমরা পুনরায় রওয়ানা হই। কিন্তু অনুমান ১ মাইল যাওয়ার পর পুনরায় অপর একটি সশস্ত্র দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারা আবার আমাদেরকে আটক করে। জয়গুরু ধ্বনি ও অনেক অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও আমাদিগকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কতক্ষণ পর শক্তি রায় আমাদের কাছে এসে আমাদিগকে তাদের দলে চাকুরী করতে বলে। আমাকে মাসিক ১০০(একশত) টাকা ও কনেষ্টবলকে মাসিক ৫০.০০ টাকা হিসেব বেতন দেবে বলে। আমি কথায় কথায় তার অনুরোধ প্রত্যাখান করলে, সে আমার কাছ থেকে এখানে সামাজিক বিচার হচ্ছে, কোনরূপ গন্ডগোল নেই, ইত্যাদি একটি কাগজে লিখিয়ে রেখে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

তৃতীয় বারের যাত্রায় পথে আর বাধা পাইনি। বেলা অনুমান ৪.৩০ মিনিট সময় এসে তুইনানী কেম্পে পৌঁছি। এখানে অনুমান আধ ঘন্টা বিশ্রাম করে আমার সঙ্গীয় কনেষ্টবল দু'জন ও তল্পীবাহক নোয়াতিয়াসহ মহারাণী বাজার অভিমুখে রওয়ানা হই। আমার সঙ্গের নোয়াতিয়া আমাদিগকে রাস্তায় না নিয়ে জমির মধ্য দিয়ে যেতে বলে। কারণ শক্তি রায় আমাদিগকে রতনমণির দলের সীমানার বাইরে নিয়ে কেটে ফেলার জন্য লোক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে। আমরা তুইনানী কেম্প থেকে মাঠে এসে দেখি যে মাঠের পশ্চিম ও পূর্বদিকের পাহাড়ের কিনারায় কিনারায় খড়গ নিয়ে দু'সারিতে কিছু লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। আমরা তখন রাস্তা ছেড়ে জলকাদার মধ্যেই ধানজমি দিয়ে চলতে থাকি। অনুমান এক মাইল দূরে(উত্তর দিকে) মাঠের মধ্যে একটি জমাতিয়া (আদিবাসী) পাড়ার ভেতর গিয়ে বিশ্রাম করতে থাকি। এ পর্যন্ত আমরা কিছু খাইনি। শরীরও খুব অবসন্ন। জমাতিয়া বাড়ীর লোকেরা আমাদের অবস্থা দেখে আমাদিগকে চিনার, কলা ইত্যাদি খেতে দেয়।

আমরাও এখানে বসে আমাদের অনুসরণকারীদের দৃষ্টিপথ এড়াবার জন্য ইচ্ছে করেই একটু বিলম্ব করে পুনরায় রওয়ানা হয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে

চলতে থাকি এবং রাত্রি অনুমান আটটার পর মহারাণী বাজারে পৌঁছে ব্যবসায়ীদের ঘরে থাকি। বাজারবাসীরা সারারাত পাহারা দিয়ে রাখে এবং যাতে কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়ি সে ব্যবস্থা করেছিল। তাদের কাছে জানতে পারি যে সন্ধ্যার সময় একদল লোক খড়গ, তরোয়াল ইত্যাদি অস্ত্রসহ বাজারে এসে আমাদের খোঁজ নিয়েছিল।

শক্তি রায়ের মন্ত্রীদের সঙ্গে উচ্চস্বরে কথাবার্তায় মনে হয়েছে আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া শক্তিরায়ের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব নয় বলেই সীমানার বাইরে নিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।

পরদিন বেলা অনুমান সাড়ে সাতটায় মহারাণী বাজার থেকে রওয়ানা হয়ে বেলা অনুমান সাড়ে ন'টায় সঙ্গীয় কনেষ্টবল ও তল্পীবাহক নোয়াতীয়াসহ থানায় পৌঁছলাম।

সরকারী প্রতিক্রিয়া

মণিময় দেববর্মার প্রবন্ধে ছাপান সরকারী চিঠিগুলি তথ্য উদ্‌ঘাটনে বিশেষ সাহায্য করেছে। এবার দেখা যাক দীনেশ বাবু কোন তারিখে উদয়পুর ফিরে এলেন। উদয়পুর কেম্প থেকে ১৪/৪/৫৩ ত্রিং তারিখে জে. এস. দেববর্মা (লেফটেনেন্ট) মেজর বি এল দেববর্মাকে বেলা দেড়াটায় জানাচ্ছেন: এইমাত্র দীনেশ বাবু (দারোগা) দুইজন পুলিশ সহ মুক্তি পাইয়া উদয়পুর হেড কোয়াটারে সকাল বেলা ১০টায় পৌঁছিয়াছে। সম্যক অবস্থা জানাইবার জন্য উক্ত দীনেশ বাবুকে সদরে প্রেরণ করা যাইতেছে। উদয়পুর পৌছিয়া দেখা গেল টাউনের লোক Panicky হইয়া উঠিয়াছে। দীনেশ বাবুর কথাবার্তায় রতনমণির Organisation কেমন হইয়াছে জানা যায়। রতনমণির নিকট যাইতে ৭টি গেট পার হইতে হয় এবং তাহারা এমনভাবে ৫টি ঘাঁটি প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহাদের Spying System এমন করিয়াছে যাহাতে তাহাদের পেছনে Brain Man আছে বলিয়া মনে হয়।

তাহারা দুই হাজার লোকের সঙ্গে যে কোন সময় Resistance দিবার ক্ষমতা রাখে। তাহাদের Organisation এ বৃটিশ ও স্বাধীনের রিয়াং ও নোয়াতিয়া আছে। লোকসংখ্যা ১২,০০০ রিয়াং, নোয়াতিয়া ৭,০০০ (সাত হাজার)। তাহাদের proper training আছে। রতনমণি রাজত্বের নমুনা স্বরূপ মন্ত্রী পরিষদ ও সৈনিক সৃষ্টি করিয়াছে ...।''

দীনেশ বাবু ১৪/৪/৫৩ ত্রিং অর্থাৎ ৩১/৭/৪৩ ইং শনিবার তারিখে উদয়পুর পৌঁছেন। তিনি ১০/৪/৫৩ ত্রিং এ উদয়পুর হইতে রওয়ানা হন এবং ১২/৪/৫৩ ত্রিং (২৯/৭/৪৩ ইং) তুইছারুবুহা ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। ঐদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে দীনেশ বাবুর দলের কোন লোক উদয়পুরের সংবাদ দেয়। এবং ঐদিনই লোক মারফৎ (রেডিওগ্রাম ছিল কিনা জানা নেই) আগরতলায় সংবাদ পাঠানো হয়। ১৩/৪/৫৩ ত্রিং (৩০,৭,৪৩ ইং) শ্রী শ্রী যুক্ত মহারাজের আদেশে উদয়পুরে লেফটেনেন্ট নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে বডিগার্ড ও সৈন্য পাঠানো হয়।

উক্ত আদেশের প্রস্তাব ১৩/৪/৫৩ ত্রিং করা হয়। মহারাজা ঐদিন স্বাক্ষর করেন এবং ঐদিনই সৈন্যদল বিভক্ত হয়ে মোটর গাড়ী সহযোগে সৈন্যবাহিনী বিশালগড় মেলাঘর রাস্তায় উদয়পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বিভিন্ন দলে কাঁকড়াবন ফেরীঘাট হয়ে রাত্রে সকলে উদয়পুর পৌঁছে। উক্ত আদেশে লেখা হয় উদয়পুর অমরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাতের দল ধৃত করা ও সায়েস্তার উদ্দেশ্য শ্রীশ্রী যুত সাক্ষাতের আদেশ অনুসারে অদ্য নিম্ন লিখিতরূপ সৈনিক ও অফিসারগণ লে: শ্রীনগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বাধীনে রাজধানী হইতে উপদ্রুত অঞ্চলে রওয়ানা হইতেছে । আদেশের সারমর্ম, জমাদার দু'জন বডিগার্ড আদাররেঙ্ক ৩০ জন, ২ নং ত্রিপুরা ইনফেন্ট্রির আদাররেঙ্ক ২ সেকসন (১৬)। এদত অতিরিক্ত রাজ্য রক্ষী বাহিনীর অফিসার সর্দারগণ ও পুলিশ কর্মচারী। করণীয় কাজ (১) সমগ্র ডাকাত দল সায়েস্তা করা। (২) প্রয়োজন বিবেচনায় আত্মরক্ষার্থে গুলী করা। (৩) সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলকেও প্রয়োজনে গুলী করা। (৪) ডাকাতদলকে ধরে আনা ও অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা। (৫) ডাকাত দল না পাওয়া গেলে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে পিতামাতা ও স্ত্রীকে ধরে আনা, এখানেই শেষ নয়। ১৪/৪/৫৩ ত্রিং তারিখে মহারাজের মঞ্জুরীকৃত একই ধরণের আদেশে লে: শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে ''বিলোনীয়া বিভাগীয় অঞ্চলের ডাকাতের দল ধৃত করা ও সায়েস্তা

করিবার উদ্দেশ্য'' সৈন্যদল বিলোনীয়া পাঠানো হয়। এই সেনাদলের সঙ্গেও রাজ্য রক্ষীবাহিনীর অফিসার, কতিপয় রিয়াং সর্দার ও পুলিশ অফিসারদের যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ২ নং ত্রিপুরা ইনফেন্ট্রির জমাদারকে উদয়পুর, অমরপুর থেকে ২ সেকশন সৈন্য নিয়ে বিলোনীয়ার মহুরীপুরে লে: শ্রী হরেন্দ্র দেববর্মার সঙ্গে মিলিত হতে বলা হয়। এই সৈন্যবাহিনী ১৪/৪/৫৩ ত্রিং আগরতলা থেকে রওয়ানা হয়ে ১৫.৪.৫৩ ত্রিং ভোরে বিলোনীয়া পৌঁছে।

প্রস্তুতি, আদেশ ও সৈন্যবাহিনী পাঠানো কি শুধু ডাকাত দলকে সায়েস্তা করার জন্য অথবা সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করার জন্য? ১২.৪.৫৩ ত্রিং তারিখে দারোগা দীনেশবাবু ও দু'জন কনস্টেবলকে জোর করে বন্দীর মত তুইছারবুহা কেম্পে নেয়ার ফলেই কি মহারাজ ক্রোধ বশত: সৈন্য পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন? সরকারী দলিল অন্য প্রকার সাক্ষ্য দেয়। মহারাজের চীফ সেক্রেটারী, ১০/৪/৫৩ ত্রিং এ কমিশনার অব পুলিশকে জানাচ্ছেন যে মহারাজের আদেশে অতি শীঘ্র একদল সৈন্য অমরপুর অঞ্চলে যাবে। একজন এস আই বা এ এস আই ও দু'জন কনেষ্টবল ঐ দলের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে মেজর কুমার বি এল দেববর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঐ সময় প্রয়োজনবোধে ইংরাজীতেও যে চিঠি লেখার রীতি ছিল, তার নিদর্শন হিসেবে চিঠির পূর্ণ বয়ান নিম্নে দেয়া হলো।

No. 2.99/ C Dt. 26/7/43
Ujjayanta palace
Kash Serestha
Agartala.

To
Commissioner of Police
Tripura state, Agartala.

A batch of military troops will very soon be going to Amarpur area under order of His Highness Maharaja Manikya Bahadur. Please depute 2 Constables and I.S.I. or A.S.I. with party on date required by Major Kumar B.L. Debvarman Bahadur whome you

are requested to consult.
By order
Sd/- P. Bhattacharjee
Chief Secy. to H.H. the
Maharaja Manikaya Bahadur.
No. 300/C dated 10.4.53 T.E.
Copy forwarded to:-
Major Kumar B.L. Debvarman Bahadur for information and favour of necessary action.
Sd/- P.Bhattacharjee
C.S. to H.H.

১০/৪/৫৩ ত্রিং তারিখ থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, পূর্বাদেশ দেয়ার পেছনে অন্যান্য আরও কারণ বা সংবাদ মহারাজের বা সরকারের দপ্তরে ছিল (যা দলিল পত্রাদি না পাওয়ার জন্য জানা যাচ্ছেনা।)

রাজ্য রক্ষীবাহিনীর লেফ্‌টেনেন্ট জে.এস দেববর্মার পূর্বোল্লিখিত রিপোর্টে বুঝা যায় উদয়পুর শহরের লোক ঐ সময় কি রকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। শুধু যে উদয়পুরের লোক আতঙ্কগ্রস্থ হয়েছিল তা নয়, সৈন্যাধ্যক্ষ ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। লে: নগেন্দ্র দেববর্মা ১৪.৪.৫৩ ত্রিং তারিখের চিঠিতে আগরতলার কর্তৃপক্ষকে জানান : কৃষ্ণপ্রসাদ (চৌধুরী) বিজয় প্রসাদ (চৌধুরী) ও তাহাদের পরিবারবর্গকে রাধাকিশোরপুর টাউন হইতে আগরতলায় পাঠাইয়া দিতেছি। যাহতে তাহাদের জন্য টাউন কোনরূপ বিপন্ন না হয়।'' ঘটনা দেখে মনে হয় তিনি, পুলিশ ও অন্য রিয়াং সর্দারসহ তুইনানী কেম্পে বা তুইছারুবুহা কেম্পে আক্রমণ করতে সাহস পাননি বা পথ প্রদর্শন করার মত সাহসী লোক উদয়পুরে পান নি।

মহারাজ বরাবরে কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর আবেদনেও সে সুর ফুটে উঠে। তাঁর চিঠির সারমর্ম: রতনমণি সাধুর আদেশে তাঁর শিষ্যগণ পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাগণের উপর যে অত্যাচার করছে তার বিবরণ পূর্বেই মহারাজাকে জানানো হয়েছে। তদন্ত কার্যে নিযুক্ত দারোগা কনেষ্টবল ও তার ভাই রাজপ্রসাদ ও অন্যান্যদের রতনমনির শিষ্যগণ বেঁধে নিয়ে গেছে। তাহাদিগকে রতনমণির কাছে বলি দেয়া হবে বলে তার শিষ্যগণ প্রচার করছে। তারা উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়ায় লুটপাট করছে এবং শহরও আক্রমণ করবে। শিষ্যগণ বন্দুক বল্লম, খড়গ ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তুইছারুবুহা, হাজাছড়া, পানছড়া ও তুইনানী ইত্যাদি ক্যাম্পগুলোয় পাঁচ/সাতশো করে সশস্ত্র শিষ্য আক্রমণ করার অপেক্ষায়।

লে: জে.এস. দেববর্মার রিপোর্ট আরও গুরুতর। রতনমণি রাজত্বের নমুনা স্বরূপ মন্ত্রীপরিষদ গঠন করে সৈন্য সমাবেশ করেছে। তারা যে কোন সময় দু'হাজার লোকের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে।

এরপর কি সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে যে রতনমণির দল সশস্ত্র বিদ্রোহী দল নয়?

অন্যান্য সূত্রের খবরে জানা যায় রতনমণির দলের সৈন্যরা মহারাণী বাজারে এসে দশ টাকার নোট দিয়ে সিগেরেট তৈরী করে ধূমপান করেছে। কারণ রতন মণি বলেছেন এ টাকা আর বেশী দিন চলবেনা। ২য় মহাযুদ্ধের সময় জাপান ও আজাদ হিন্দ সৈন্য চট্টগ্রাম, আরাকান, মণিপুর অঞ্চলে যুদ্ধ করেছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের এক সংকটজনক মুহূর্তে এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে জাপান বা আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগাযোগের সন্দেহ করা অমূলক নয়, যদি ও বাস্তবে যোগাযোগের কোন প্রমান নেই। আদেশ থাকা সত্ত্বেও লে: নগেন্দ্র দেববর্মা, ১৪ শ্রাবণ ও ১৫ শ্রাবণ উদয়পুর শহরাঞ্চলের বাইরে যায়নি। কারণ ১৫ শ্রাবণ ৫৩ ত্রিং আগরতলায় সংবাদ পাঠান '' এইমাত্র জানিতে পারিলাম রতনমণি দস্যুর স্ত্রী কতগুলি খাসিয়া ও রিয়াং নিয়ে তুইছারুবুহা কেম্পে পৌঁছিয়াছে।'' রতনমণির শিষ্যাদের বক্তব্য অনুসারে এতথ্য সত্য নয়।

যাহোক ক্যাপ্টেন বি.এল. দেববর্মার নির্দেশে ১৬ শ্রাবণ ৫৩ ত্রিং লে: নগেন্দ্র দেববর্মা তুইনানী ক্যাম্প অঞ্চলে অভিযান চালান । এই বিদ্রোহীদলে ৩০০ লোক ছিল। ১০০ বন্দুক ছিল। সৈনিকেরা উপরের দিকে গুলী করলে তারা পালাতে থাকে। ''দস্যুদল আমাদের (সৈন্যদল) সঙ্গে বাস্তবিকই ফাইট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমাদের (সৈন্যদের) সাবধানতার জন্য কিছু করিতে পারে নাই। এই সংঘর্ষে তৈন্দুল রিয়াং গুলী বিদ্ধ হয়ে মারা যায়। তারপর শিলারাম নামক একটি রিয়াং বর্তমানে সেও রাজা নামে অভিহিত তাহাকেও ধরি'' এবং তার সাহায্য ২৩২ জন ছেলেমেয়ে সহ ৪৬৪ জনকে ধরা হয়। এখানে ৭টি বন্দুক (এর মধ্যে ৪টি রাজ্যরক্ষী বাহিনীর ৯৪ টি দা, ৭টি কাঁচি ও একটি তলোয়ার) বাজেয়াপ্ত করা হয়। সৈন্যদের পেছনে রাজ্যরক্ষী বাহিনীর ভলান্টিয়ার ও কর্মাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন ঠাকুর ছিলেন। তার কাছে বাজেয়াপ্ত দ্রব্যাদি ও আসামী বুঝিয়ে দেয়া হয়। ''ত্যাংখ্যা রায়, হান্দাইসিং, কাঠল রায় প্রভৃতি মন্ত্রীরা পালাইয়া যায়। মহারাজের আদেশ থাকায় মেয়েলোকগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য ৪ জন পুরুষ লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।''

তুইছারবুহাতে ১৮ শ্রাবণ লে: নগেন্দ্র দেববর্মা পৌঁছার পূর্বেই সকলে পালিয়ে যায়। ক্যাম্পঘরগুলিতে কোন জিনিষ নেই। ঘরগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। লে: নগেন ঠাকুর সসৈন্যে নতুন বাজার হয়ে ডম্বুর পর্যন্ত যান। পথে বিদ্রোহীদের বাড়ীঘর পুড়ানো হয়। ডম্বুরে খুসীকৃষ্ণকে তার বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। সে রামবাহাদুর উদ্দেশ্যে লুসাই রওয়ানা হয়ে গেছে। তার বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

মনোরঞ্জন ঠাকুরের দল সৈন্য দলের পথ অনুসরণ করে নতুন বাজার পর্যন্ত যান। তিনি লেখককে বলেন, অনুমান ৬০০/৭০০ লোককে গ্রেপ্তার করে

আগরতলার উদ্দেশ্যে পাঠান হয়। তুইছারুবুহা কেম্পের কাছে জংগলে অনুমান ১০ মণ দেশী গাঁজা পান এবং সীজ করেন। মনোরঞ্জন ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। স্থান মনে নেই। একটি পুরাতন জুমের কাছ দিয়ে সদলবলে যাওয়ার সময় দেখতে পান পুরানো টং ঘরের ভেতর থেকে একটি রিয়াং যুবক বন্দুক তাক করে আছে। তিনি চিৎকার করে গুলী করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ দেন। পেছন দিক দিয়ে লোক পাঠিয়ে এবং সম্মুখ ভাগ থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে যুবকদ্বয়কে ধরে ফেলেন। তার একনালী কেপদার বন্দুক কেড়ে নেয়ার পব দেখেন তাতে গুলী নেই এবং বারুদ নেই।

বন্দুক যোগাড় করতে পারলেও বিদ্রোহীগণ যুদ্ধের ডামাডোলের সময় যথেষ্ট পরিমাণে বারুদ যোগাড় করতে পারেনি।

লে: হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ও তাঁর পার্টি আখাউড়া হতে রেলযোগে রওয়ানা হয়ে ১৫ শ্রাবণ রবিবার ভোরে বিলোনীয়া পৌঁছেন। তাঁর লেখা 'ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহ বা রতনমণি আন্দোলন' প্রবন্ধ ও 'একটি বিতর্কিত চরিত্র' প্রবন্ধে মুদ্রিত দলিল থেকে মিলিটারী অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া গেল।

খগেন্দ্র রায় বিদ্রোহীদের ভয়ে বিলোনীয়ায় বাস করছেন। লে: দেববর্মা যখন মহকুমা শাসক ও খগেন্দ্র রায় (রিয়াংদের রায় বা রাজা) সহ বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করার বিষয়ে আলোচনা করছিলেন এমন সময় দু'জন এসে জানাল বিদ্রোহীরা বগাফায় রায়ের বাড়ি লুট পাট করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পুলিশ সহ সৈন্য বাহিনী ১২ মাইল দূরে বগাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে দেখেন বাড়ীঘর তখনও জ্বলছে। মিলিটারী ও পুলিশ দেখে কিছু লোকজন জমা হল। তাদের কাছ থেকে জানা গেল বিদ্রোহীরা বাইখোড়ার দিকে গেছে। সেখান হতে অনুমান ২০০ স্থানীয় রিয়াংসহ সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকেরা বাইখোরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। বাইখোরাতে অনুমান ৪ ঘটিকায় পৌঁছে সামান্য বিশ্রাম করে লক্ষীছড়ার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা করলেন। জংগল শেষে ধান ক্ষেতে পৌঁছে তারা দেখলেন সামনের টীলায় (মার্থাহা রিয়াং চৌধুরী পাড়া) বিদ্রোহীদের ভোজনপর্ব চলছে। বিদ্রোহীদের রক্ষীদ্বয়ও সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পেয়েছে।

বিদ্রোহীরা দলে অনুমান ৪০০/৫০০ শো জন। মার্থাহা চৌধুরীর কাছ থেকে ১০০,০০ টাকা জোর করে আদায় করে ও কান্তলা চৌধুরীর মহিষ কেটে খাওয়ার ব্যবস্থা করে। তারা সেখানে রাজবিদ্রোহজনক কথা প্রচার করে ও রতনমণির জয়ধ্বনি দেয়। অনুমান ৪.৩০ মি: সময় মিলিটারী ফোর্স উপস্থিত হলে বন্দুক, দা, খড়গ, বল্লম নিয়ে বিদ্রোহীরা আক্রমণ করতে উদ্যত হয় এবং টিলার থেকে মাঠের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিদ্রোহীরা সৈন্য দলের উপর দু'বার গুলী ছুড়ে এবং নীচের দিকে চীৎকার করে দৌড়ে আসতে থাকে। সেনাধ্যক্ষ সৈন্যবাহিনীকে দু'দলে ভাগ করে, জমাদারের দলকে পাঠালেন টিলার পূর্ব দিক

দিয়ে এবং নিজে রইলেন দক্ষিণ দিকে। সৈন্যধ্যক্ষ সঙ্গিণসহ চার্জ করে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা পর পর গুলী ছুড়তে ছুড়তে দৌড়ে আসতে লাগল। বাধ্য হয়ে সৈন্যধ্যক্ষ রিপিট ফায়ারের আদেশ দিলেন। গুলীর মুখে দাঁড়াতে না পেরে বিদ্রোহীরা পালাতে লাগল। ধান ক্ষেতের ভেতর থেকে তারা যখন উপরে উঠে এলো তখন প্রায় সবাই পালিয়ে গেছে।
মিলিটারী ও পুলিশ টিলার উপরে আহত দু'জন সহ মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। একজন কয়েক ঘন্টার পরে মারা যায়।
তিন জন আসামী সহ মিলিটারী রাতেই বিলোনীয়া ফিরে যায়।

আত্মরক্ষা

লক্ষ্মীছড়ায় প্রথম এবং শেষ বারের মত বিদ্রোহীরা সাহসের সংগে মিলিটারীর সংগে সামনা সামনি যুদ্ধ করে। শিক্ষিত মিলিটারীর রাইফেলের সংগে কেপদার বন্দুক, বল্লম দিয়ে পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত তাদের পালিয়ে যেতে হয় রতনমণির কাছে।
লাউগাং কেম্পে রাজ্য রক্ষী বাহিনীর লে: নবীন ঠাকুর ছিলেন। সেখানে দারোগা বাবুর দল এক সংগে মিলিত হন ১৬ শ্রাবণ। রতনমণির দল এখনও বগাফা কেম্পে আছে বলে তারা জানতে পারেন। মিলিটারী চলে যাওয়ায় তারা অসহায় বোধ করেন এবং মিলিটারী পাঠাবার জন্য সদরে আবেদন করেন।
রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি, সৈন্য চালনা, রাজ্যরক্ষী বাহিনী মোতায়েম, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও গুলী করার আদেশ প্রমাণ করছে, রতনমণির দল ডাকাত নয় বিদ্রোহী দল; আর মহারাজের দৃষ্টিতে যুদ্ধ বিরোধী পঞ্চম বাহিনী শত্রুর সাহায্যকারী।
এই বিদ্রোহ দু'দিনের মধ্যে দমন করার মৌখিক নির্দেশ ছিল। তাই সৈন্য ও রাজ্যরক্ষীবাহিনীর পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি তৎপরতা দেখা যায়। অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা ও জনসাধারণের ভীতি বা ত্রাস দূর করা এবং সৈনিকদের নৈতিক বল বৃদ্ধির জন্য মহারাজ স্বয়ং উদয়পুর হতে নৌকা যোগে অমরপুর পরিক্রমা ২৪ শ্রাবণ শেষ করে আসেন। ১৫ শ্রাবণ ১ লা আগষ্ট ১৯৪৩ ত্রিং রাত্রে চন্দ্রমণি, রামপ্রসাদ, রতনমণির ভাই সকাম্লা নোয়াতিয়া প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়গণ অধিক রাতে এসে তুইছারুবুহা পৌঁছেন। তারা গুরুর কাছে বগাফার এবং লক্ষ্মীছড়ার সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ ও

গুলী চালনার ঘটনা বিবৃত করেন। রতনমণির সৈন্যবাহিনীর সংগে মোকাবিলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বিবেচনা করে আত্মরক্ষার জন্য রামসিরা (রামগড়) যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং শিষ্যগণকে অন্যস্থানে গিয়ে আত্মরক্ষার উপদেশ দেন।

ঐ দিন শেষ রাতে বা পরদিন অতি ভোরে সর্প জয়, কৃষ্ণরাম, চন্দ্রমণি, বিচিত্র প্রভৃতিসহ রতনমণির সংগে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করেন। তারা সঙ্গে কিছু অর্থ ও খাদ্য নেন। পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাঁকে সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দেন। সংগে গিয়ে বা পরে গিয়ে ছেনিফা বালাফা, চৈত্রসেন, দাবা রায়, বিচিত্র, মুকুন্দ, কান্ত রায়, তবিয়া রায় প্রভৃতি রামসিরাতে রতনমণির সংগে যোগ দেন। তসলমফা ও রামসিরা অঞ্চলে গিয়ে রতনমণিকে দেখে আসেন।

শ্রী মুকুন্দ রিয়াং এর বক্তব্য থেকে বিস্তৃতভাবে জানা যায়, ঘটনার দিন সাতেক পর তারা রাতে রামসিরায় দুই বাড়িতে ছিল। রামসিরার নিকটবর্তী বাজারের নাম চাকমা বাজার। মুকুন্দদের দল ছিল রতনমণির পুরাণো বাড়িতে আর রতনমণি অন্য দলসহ ছিলেন দূরবর্তী নতুন বাড়িতে। ভোর রাতে গুলীর শব্দে মুকুন্দের ঘুম ভেঙ্গে যায় ও চীৎকার শুনতে পান। সংগে সংগে পুলিশ এসে তাকে ধরে। চৈত্র সেন ঘটনা স্থলেই মারা যায়। সেখান থেকে মুকুন্দ কান্ত রায় ও তবিয়াকে রাংগামাটি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। দাবা রায়ের হাতে গুলী লাগে। তাকে চট্টগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং তিনি সেখানে মারা যান। অনুমান ছয় মাস পর রতনমণিকে দীঘিনালা থানা অঞ্চল থেকে ধরে রাংগামাটি জেলে নিয়ে আসে। কিছুদিন পর রতনমণি, মুকুন্দ, কান্ত ও তবিয়াকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। সেই বেদনাদায়ক দিনের কথা মুকুন্দর স্পষ্ট মনে নেই। তাকে জেলের বাইরে মারধর করা হয়। রাত্রে সে জেল গেইটে ছিল। শেষ রাত্রে তাকে জানান হয় রতনমণি মারা গেছেন। সে আর রতনমণিকে দেখে নি। কিছুদিন পর তবিয়া অসুস্থ হয়ে জেলে মারা যায়। মুকুন্দ রিয়াং বলেন, এখান থেকে ছাড়া পাবার পর তাকে ছয় মাস চট্টগ্রাম জেলে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়।

আরও দুই তিনজন যারা রতনমণির সংগে ছিলেন, চট্টগ্রাম পুলিশ তাদের ধরেনি বা ধরতে পারেনি। দেখা যাচ্ছে রতনমণি একাই গ্রেফতার হন।তিনি বার্মা যাবার পথে ধৃত হন এই তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য ভাববার বিষয়।

তখন বার্মা সীমান্তে বা ভারতীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চলছিল। সে ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মগোপনের চেষ্টা করাই সমীচীন বলে মনে হয়। রতনমণির বয়স তখন ৬০-এর কাছাকাছি বা উপর। মাথায় বেশ বড় জটা ছিল। সেই জন্যই বোধ হয় রতনমণির শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হয়নি।

ডিসেম্বর মাসে বন্দীদের হস্তান্তরিত (Extradiction) করা হয়। ১৯৪৩ ইংরেজীর ডিসেম্বরের যে কোন দিন রতনমণি ও অন্যান্যদের আগরতলার আনা হয়। সম্ভবত: ঐদিন বা পরদিন তাঁকে জেল থেকে বা সরাসরি রাজপ্রসাদের বডিগার্ড দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শারীরিক নির্যাতনের ফলে তার মৃত্যু হয় বলে প্রকাশ। সরকারপক্ষ থেকে কলেরা রোগে রতনমণির মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়। এই ৪ জনের মৃত্যু আরও দু'জনের মৃত্যুর উল্লেখ একটি বিতর্কিত চরিত্র প্রবন্ধের পরিবেশিত দলিলে পাওয়া যায়। দক্ষিণ মহারাণীতে সৈনিকের গুলীতে মারা যায় তাইনদুল রিয়াং। বিলোনীয়ার লক্ষ্মীছড়া মৌজার মার্থাহা চৌধুরীর বাড়ীর (রিয়াংদের মতে চানদাফা বাড়ী) কাছে যার গুলীতে মৃত্যু হয় তার নাম উল্লেখ নেই; তাদের নাম রবিরায় রিয়াং পিতা ৺কাছারায় (গ্রাম গংগারায়)। তাছাড়া আরও দু'জনের গুলীতে মৃত্যু ঘটেছে বলে রতনমণির শিষ্যদের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়। তাদের নাম (১) বিলোর্নায়া লাউ গাং-এর পুষ্পরাম রিয়াং পিতা বলিরাম রিয়াং (২) ধলা বাধির (অমরপুর) গর্ভবতী স্ত্রীলোক নয়ন্তি রিয়াং।

" Tripura in Transition" - এ লিখিত বিলোনীয়ার দেবীপুরে গুলীর আঘাতে নিহত দক্ষিণ মহারাণীর মহুয়া রিয়াং-এর ঘটনার সমর্থন লেখক পান নি। তবে মহুয়া বা মাহুয়া রিয়াং এবং পুষ্পরাম রিয়াং একব্যক্তিও হতে পারে।

লক্ষ্মীছড়ায় একব্যক্তি গুরুতর আহত হওয়ার উল্লেখ দলিলে পাওয়া যায়। কিন্তু নামের উল্লেখ নেই। তার নাম ইয়োক পাইছা বা সৌক পাইছা রিয়াং পিতা ৺সানাউল্লা আদি বাড়ি তইমইখছড়া। লেখকের সংগে তার দেখা হয়েছে। তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

লক্ষ্মীছড়া মৌজার গুলীর আঘাতে বালা রায় রিয়াং-এর ভাই কেলা সিং ফাও আহত হয় বলে দাবী করা হয়। মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৮, আহত ২।

বিচার

১৮ শ্রাবণ হ'তে বন্দীগণ আগরতলা পৌঁছাতে থাকে। রাজ্য রক্ষীবাহিনী, কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে পদব্রজে আগরতলা পাঠান হতে থাকে। মাসাধিক কাল ধরে এই পর্ব চলতে থাকে। কাঠালিয়া ছড়ার (বগাফার) রিয়াংদের সংগে আলাপ করে লেখক জানতে পারেন অনেকে নিজ থেকে এসে কেম্পে বা থানায় আত্মসমর্পন করে। ৪ জন তাকে বলেছে তারা নিজ থেকে পূজার পূর্বে বিলোনীয়া গিয়ে আত্মসমর্পন করে এবং তারা যা করেছে তা অকপটে স্বীকার করে। এভাবে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ধরা দিয়েছে। তারাও বন্দী বলে গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরা ইন ট্রেন্‌জিশন-এ সেন মহাশয় লিখছেন : " Their (Reang) leaders claim that 20,425 people were all togather arrested but officer in charge of the office of Govt. of Tripura asserts that the member was below 3000 thousand."

দু'হাজার হোক, বা তিন হাজারই হোক এ সংখ্যক লোককে ডাকাতির জন্য গ্রেফতার করা একটি অসাধারণ ঘটনা। এ' সংখ্যক লোক একত্র হয়ে ডাকাতি করে না; যা করে তার নাম বিদ্রোহ।

লে: ঠাকুর জিতেন্দ্রমোহন দেববর্মা ও মেজর কুমার ব্রজলাল দেববর্মার উপর ঐ সমস্ত আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ, ছাড়া, আটক রাখা বা মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কার্যত: জিতেন ঠাকুর মহাশয়ের নির্দেশের উপর আসামীগণকে আটক ও মুক্তি নির্ভর করত। এমন একটি স্লিপের উল্লেখ 'একটি সরকারী চিঠিতে আছে। যা উপরোক্ত তথ্যের পরিপূরক। জিতেন ঠাকুর মহাশয়ের বক্তব্য হচ্ছে মাত্র কয়েকজন ছাড়া বাকী সকলকেই দু' থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের রাজগুরু বা গুরুবংশের কাছ থেকে মাথা মুড়িয়ে পৈতা গ্রহণ করত: বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হত। এই বক্তব্যের সমর্থন বহু লোকের কাছ থেকে এবং সেন মহাশয়ের লেখা থেকে পাওয়া যায়।

'ত্রিপুরা ইন ট্রেনজিশনে' সেন মহাশয় লিখেছেন যে কিছু সংখ্যক রিয়াং যুবকের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও ডাকাতির অভিযোগ আগরতলা কোর্টে আনা হয়েছিল কিন্তু সরকার প্রথম স্তরেই মোকদ্দমা তুলে নেন।

অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টার দীনেশবাবু বলেন, ''শক্তিরায় রিয়াং গং তের জনের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা Special Court - এ বিচার হইয়াছিল।

প্রত্যেকের এক বৎসর ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদন্ড হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কোন ধারায় বিচার হইয়াছিল মনে নাই।''

রতনমণি মন্ত্রীসভার এক নম্বর মন্ত্রী শ্রীতাইন্দা রায় রিয়াং (বয়স ৯৫ বৎসর) রোগ শয্যা থেকে লেখককে বলেন যে তিনি ১৬ মাস জেলে ছিলেন। কিছুদিন পর পর কোর্টে যেতে হতো। বিচার হয়েছিল, সব মনে নেই। তিনি বলেন যে, তারা শেষ পর্যন্ত ৯ জন জেলে ছিলেন। উপস্থিত লোকের সাহায্য নিয়ে তাদের নাম ও ঠিকানা বলেন। নিচে তা দেওয়া হলো।

নাম/পিতার নাম	বর্তমান- ঠিকানা	পূর্ব-ঠিকানা
১। তাইন্দা রায় রিয়াং পিতা ৺দলাইছা।	বগাফা কাঁঠালিয়া	তুইছারুবুহা
২। শ্রীকান্ত রায় রিয়াং	দশদা আনন্দবাজার	দ: মহারাণী।
৩। শ্রীমুকুন্দ রিয়াং পিতা ৺খালেহা	দ: মহারাণী	''
৪। ৺তবিরাম বা তবিয়া রিয়াং	লাউ গাং	খমলুং
৫। ৺শিলা রায় রিয়াং	দ: মহারাণী	দ: মহারাণী
৬। ৺শক্তিরায় রিয়াং	লংতরাই	
৭। ৺মাংছল বা মাওছলা রিয়াং	দেওগাং	দ: মহারাণী
৮। ৺হান্দাই সিং রিয়াং	''	''
৯। ৺বাম বাহাদুর	দশদা	দশদা

মুকুন্দ রিয়াং বলেন যে তারা তেরজন জেলে ছিলেন। একজনের নাম মনে নেই। পূর্বোল্লিখিত ৯ জন ছাড়া অবশিষ্টে তিন জনের নাম (১০) দৈন্যরাম রিয়াং (১১) ফ্লেফা রিয়াং (১২) রূপাইফা রিয়াং। তাদের একবছর জেল হয়েছিল। বিচার শেষ হওয়ার তিনদিন পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। মুকুন্দ যেহেতু ৬ মাস পর আগরতলা জেলে এসেছিল সেজন্যই বোধহয় ছয়মাস বাদ দিয়ে একবছরের আগরতলা জেলের কথা তার মনে ছিল।

এই তিন জনের বক্তব্যের ভিত্তিতে লেখকের সিদ্ধান্ত যে, তাদের একবছর ছ'মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়েছিল।

স্বদেশী দল

''একটি বিতর্কিত চরিত্রে'' পরিবেশিত চিঠিপত্র মূলে দেখা যায় বিলোনীয়া থানায় দু'টি ও অমরপুর থানায় একটি ডাকাতির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার তারিখের উল্লেখ নেই। অমরপুরের দারোগার তদন্ত ডাইরির নকল ''ঘটনাস্থান কুর্মা, স্বদেশী দলের লোকেরা তর্বং চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ রিয়াং ও শ্রীচরণ রিয়াংয়ের বন্দুক তালাস করেছিল। তারা রাজ্যরক্ষী বাহিনীর ভলান্টিয়ার এবং রতনমণির শিষ্য। রাত্রেই স্বদেশী তর্বং চৌধুরীকে দু'কড়ি টাকা জরিমানা করে স্বদেশী দলের লোকেরা আদায় করে।'' দু'টি কেপদার ১ নালী বন্দুক অবশিষ্ট চালসহ, তর্বং চৌধুরীকে বেঁধে রতনমণির শিষ্য করার জন্য তৈছারুবুহা নিয়ে যায়।

তর্বং চৌধুরীকে হত্যা করার জন্য নেয়া হয়নি। তাকে রতনমণির শিষ্য করার জন্য নেয়া হয়েছিল। এই ডাকাতি এক বিশেষ ধরণের ডাকাতি। দারোগা বাবুর এ'সময়ের রিপোর্টেই দেখা যায় ''স্বদেশী দলের লোক''। তাহলে প্রমাণ হচ্ছে মহারাজ কর্তৃক সৈন্যবাহিনী প্রেরণের পূর্বেই এদল ''স্বদেশী দল'' নামে পরিচিত ছিল।

বিলোনীয়া থানার ডাকাতি অভিযোগের তদন্ত হয় ১৯/৪/৫৩ ত্রিং তারিখে অর্থাৎ মিলিটারী এক্সানের পর। এর পূর্বে দারোগাবাবু অনুসন্ধান করতে সাহস পাননি। ডাকাতির পূর্বে দৈস্তাহা চৌধুরী ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। দারোগাবাবু মালামাল 'চুরি' যাওয়ার বিষয় জানতে পারেন এবং আরেকটি বাড়ীতে 'চুরি' যাওয়ার বিষয়ও জানতে পারলেন। উদয়পুর থানার অভিযোগ ও অনুসন্ধানের বিষয় পূর্বেই বলা হয়েছে।

ঐ সময় সাধারণত: আদিবাসীগণ সর্দার, চৌধুরী ও মিসিপ মারফৎ রাজদরবারে অভিযোগ পেশ করতেন। রিয়াং আন্দোলন ছিল বিশেষ ধরণের আন্দোলন। রায়ের বা চৌধুরীদের সব অভিযোগ মিসিপ মারফৎ বা আবেদন যোগে রাজ দরবারেই পেশ হত। রিয়াং আদিবাসীদের বিশেষ বিষয়ের অভিযোগ বা সামাজিক বিচারের সিদ্ধান্ত শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতেই নেয়া হত। সে জন্যই বোধহয় বিভাগীয় থানার আন্দোলনের প্রথম অংশে

কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়নি। অন্তত: ১০ শ্রাবণ, ৫৩ ত্রিং যখন মহারাজা উদয়পুর - অমরপুর সৈন্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন তখনই বোধহয় থানাগুলোতে অভিযোগ লিপিবদ্ধ ও অনুসন্ধানের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়। এবং সে কারণেই বোধহয় উদয়পুরের বড় দারোগা বাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অপর দারোগা বাবুকে পাঠান, যেহেতু তার নিজে যাবার সাহস ছিল না। জানা যায় যে অমরপুরের দারোগা বাবুও অভিযোগের অনুসন্ধান কাজে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং তাদিগকেও বন্দী করার জন্য বিদ্রোহী বাহিনী ফৌজ পাঠিয়েছিল। তিনি কৌশলক্রমে সাফল্যজনক ভাবে পশ্চাদাপসরণ করেন।

রতনমণির দলের পরিচয় ''স্বদেশীদল'' হলো কি করে? শুধু অমরপুরের দারোগা বাবুই স্বদেশীদল উল্লেখ করেননি। কলসী মাথা কেম্প থেকে ২১ শ্রাবণ ৫৩ লে: শ্রী এইচ. কে. দেববর্মণ যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতেও তিনি 'স্বদেশীদের' উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে কারও কাছ থেকে কিছু জানা যায় না, কেহ ''তাহাদের বাড়ীঘর পর্যন্ত দেখাইয়া দেয় না। এখানকার চৌধুরীরা পর্যন্ত এইসব করিতেছে। এমনকি গোপনে গোপনে লোক পাঠাইয়া প্রায় সমস্ত স্বদেশীদের সাবধান করিয়া দিতেছে। কাজেই প্রায় সবখানেই আমরা কে দোষী আর নির্দোষী বুঝিতে পারিতেছিনা।'' লে: দেববর্মা তাঁর ৭ দিনের পরিক্রমা শেষে ডাকাত দলের লোকদের 'স্বদেশী' বলে উল্লেখ করেছেন। এই স্বদেশীদের প্রতি চৌধুরীদেরও যথেষ্ট সহানুভূতি আছে দেখা যাচ্ছে। চৌধুরীরা স্বদেশীদের গ্রেফতারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি।

এই স্বদেশীদল পরিচিতি কোথা থেকে কেমন করে এল বা কেন এল? তারা (রতনমণির দল) নিজেরা এই নাম গ্রহণ করেছিল মনে হয় না। সরকারী দলিলে তাদের পরিচয় ডাকাতদল বলে পরিচিত। স্থানীয় পরিস্থিতির চাপে দারোগাবাবুও লেফট্যানেন্ট মহাশয়ের কলমে প্রকৃত পরিচয় বের হয়ে এসেছে। এই পরিচয় তদানীন্তন জনসাধারণের মুখে মুখে। তাদের কার্যাবলী চালচলন ও উদ্দেশ্যের মধ্যে জনসাধারণ স্বাদেশীকতার গন্ধ পেয়েছেন এবং সেই জন্যই তাদের ''স্বদেশীদল'' বলে সম্বোধন করেছেন। সেই স্বাদেশীকতা অনুসন্ধানেরই বিষয়।

অমরপুরের দারোগা বাবুর রিপোর্টে দেখা যায় রাজ্যরক্ষী বাহিনীর লোকেরাও রতনমণির দলে যোগ দিয়েছিল। দক্ষিণ মহারাণীতে বাজেয়াপ্ত ৭টি বন্দুকের মধ্যে ৪টি রাজ্যরক্ষী বাহিনীর, দেখা যাচ্ছে আন্দোলনের

চরম মুহূর্তে রিয়াং রাজ্যবাহিনীর একটি অংশ রতনমণির দলের সংগে স্বেচ্ছায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে চাপে পরে যোগ দিয়েছিল।

আনুসংগীক তথ্য

রতনমণির মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী ছিল কিনা জানা যায় না তবে এক নম্বর মন্ত্রী ছিলেন শ্রীতাইন্দা রায়। বয়স ৯৫, তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী। ভাল বাংলা বলতে পারেন না। তাই দু'ভাষী মারফৎ তাঁর বক্তব্য শুনতে হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা এইরূপ :-

'' হন্তারায়, তবলা হাম, গংগা রায় ও তীর্থরায় প্রভৃতি সর্দারগণ জরিমানা করত, বলত তোমরা রাজার বিরুদ্ধে চলছ (বিরুদ্ধাচরণ করছ) বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে.তোমাদের যোগ আছে। সময় সময় রাজ্যরক্ষী বাহিনীর গারদে আটক করে রাখত।

মহারাজার কাছে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। তাদের বিচার ও অত্যাচার শেষ হয় না। ২৫ জন সভ্য নিয়ে কমিটি হয় (মীমাংসা করার জন্য)। রামবাহাদুর ও দাবারায় প্রভৃতি আরও অনেকে লুসাই (জম্পুই পাহাড়ে) যায়। কে,টি চাওমাকেও সংগে নিয়ে আসে মীমাংসা করার জন্য। (লুসাই চীফ রাং বুহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাহার পুত্র কে,টি চাওমাকে পাঠিয়ে দেন) ।২৫ জন সভ্যসহ বগাফাতে খগেন্দ্র রায়ের বাড়ীতে যায়। কোন মীমাংসা হয় না। কিন্তু ''রায়'' আক্রমণের নাম করে মিথ্যা মামলা দেয়। খুসীকৃষ্ণ ত্রিপুরা হান্দাই হিং ও কান্ত রায় কে গ্রেপ্তার করা হয় ও আগরতলায় ৪৮ দিন আটক রাখা হয়। ব্রজলাল কর্তা তাদের ছেড়ে দেন ও উপদেশ দেন নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিচার করে মীমাংসা করার জন্য।

''জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৩৫৩ ত্রিং) চেলাগাং এর খুমলং এ সভা হয় ঐ পঁচিশ জনকে নিয়ে। তাইন্দাবায়কে খাদ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়, অন্যান্য ২৪ জনকে লোক সংগ্রহের ভার আমাকে দেওয়া হয়। তারা সংগে সংগে কাজে বের হয়ে যায়।

পরে তুইছারুবুহাতে 'রতনমণি সহ সভা হয়। তখন পাঁচজন মন্ত্রী ঠিক করা হয়। সেখানে ঠিক হয় সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরাই করব।

জিনিষপত্র যোগাড় করার আদেশ দেওয়া হয় এবং জিনিষপত্র আসতে থাকে। সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের ৬/৭ দিন পর আমাকে তুইছারুবুহার জঙ্গল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।''

পাঁচজন মন্ত্রীর নাম (১) তাইন্দা রায় রিয়াং পিতা দলাইহা (তুইছারুবুহা) (২) শিলারাম (রায়) রিয়াং (দ: মহারাণী) (৩) কানাইচন্দ্র রিয়াং পিতা লিখিচরণ হেজাছড়া (অমরপুর) (৪) নিধিরাম রিয়াং (কুমা, অমরপুর) (৫) বিশ্বমণি রিয়াং পিতা গদাচন্দ্র (কালাঝরি, অমরপুর)

কাঠালছড়া, বগাফায় অনুসন্ধানে প্রাপ্ত সেনাপতির নাম (১) শক্তি রায় (২) কৃষ্ণরাম (তুইছারুবুহা) (৩) রামপ্রসাদ (তুইছারুবুহা) (৪) কান্ত রায় (দ: মহারাণী) (৫) সর্প জয় (৬) হান্দাই সিং দ: মহারাণী (বগাফা)। এরা সকলেই রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক।

রাজজয় রিয়াং পিতা: খাতা রায় রিয়াং (পূর্ব বগাফা) নিজের সম্পত্তি ও অর্থ গুরুর আন্দোলনের জন্য ব্যয় করেন। তিনিই খাজাঞ্চী বা মহাজন ছিলেন। অমরপুর চেলাগাং-এর লুন্দাহা রিয়াং আশ্রম ও কেম্পের হিসাবপত্র রক্ষা করতেন। নেতৃস্থানীয় শক্তিরায়, আলু ফা, তসলাম ফা, চক্র ফা, গোরা খাং প্রভৃতি লেখকের বিশেষ পরিচিত ছিল।

রতনমণির ভক্ত শিষ্যগণ এখনও সন্ধ্যাবেলায় প্রার্থনা সভায় গান করেন একতারা বাজিয়ে -

ওঁ ছে ব্রহ্মা	ওঁ ছে বিষ্ণু
ওঁ ছে মহেশ্বর	ওঁ ছে নর ঈশ্বর
ওঁ ছে স্বর্গ	ওঁ ছে মর্ত আদি

এরপরই গুরুবন্দনা করেন -

জগনি গুরু সে সব	সেই জগতের গুরু
মানিয়া মুনুছে	মানুষ (দ্বারা) আইন মানে না
রতন গুরু যে অব	সেই রতন গুরু
মানে খা আমানুং নঅ	তুমি আমাদের মা বাবা
বিজয় আমানুং নঅ	জয় বিজয় তোমার কাছে
বিজয় কালী মা	তুমিই মা কালী

দেবানি ফাইমি সেঅব	দেবতা হতে তিনি আসেন
আদিনি ফাইনি সেঅব	(তিনি) আদি হতে আছেন
দেব বাই আদি সেঅব	দেব তিনি আদিও তিনি
রতন সাম নঅব	রতন এই বলেন
অদিনি সামি সেঅব	আদির কথা বলেন
বংশ সে ঈশ্বর	বংশই ঈশ্বর
বংশ নঅ উদার খেনাই।	বংশের উদ্ধার করেন।

সেই রতনমণির বাড়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমার দেওয়ান বাজারের কাছে রামচীরা গ্রামে। তার পিতার নাম নীলকমল নোয়াতিয়া। তিনি লেখাপড়া জানতেন। বিশেষ পরীক্ষা পাশের খবর শিষ্যদের কাহারও জানা নাই। তিনি লোকমান সাধু নামে পরিচিত ছিলেন। রতনমণির কোন রিয়াং স্ত্রী ছিল বলে তার শিষ্যগণ বলেন না; চার স্ত্রী ছিল বলেন। তবে চার স্ত্রী একসংগে বর্তমান ছিল অথবা এক স্ত্রীর অবর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে ছিলেন সে বিষয়ে বিস্তৃত নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইনি। তার সন্তান ছিল। এক কন্যার বিবাহ হয়েছে। সে বর্তমানে ত্রিপুরায় আছে বলে জানা যায়।

রতনমণির গলায় মালায় একাধিক রুদ্রাক্ষ ছিল। শিষ্যগণ একটি করে রুদ্রাক্ষ ধারণ করত। শিষ্যগণ বলেন তিনি হরিনামের মন্ত্র দিতেন ''ওঁ প্রাণ: রাম'' বলে। প্রেমের অবতার চৈতন্যের বিষয়ে উপদেশ দিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে গল্প বলে উপদেশ দিতেন। তিনি ১২ বছরের উপর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন তিনি ঘটনার (১৯৪৩ ইং সনের) ৭ বছর পূর্বে আসেন, কেহ বলেন ১০ বছর পূর্বে আসেন। অনুমান ১৯৩৪-৩৫ ইং সনে আসেন কারণ খুসীকৃষ্ণ তাদের গানের বই ১৯৩৬ ইং সনে ছাপিয়ে ছিল। ১৯৩২ ইং সনে ত্রিপুরার খুসীকৃষ্ণ নোয়াতিয়া রামচীরা বা রামসীরা গিয়ে রতনমণির প্রথম শিষ্য হন। খুসীকৃষ্ণ, গেলাকৃষ্ণ, চৈত্রসেন ও অন্য একজন শিষ্যসহ তিনি অমরপুরের (চেলাগং নতুন বাজারের মাঝামাঝি) এক ছড়ি মৌজায় 'তাওফম' -এ প্রথম আশ্রম করেন। ধীরে ধীরে অমরপুরের ডম্বুরে প্রেমতল আশ্রম, সামখুম ছড়া ও উদয়পুরে দক্ষিণ মহারাণী প্রভৃতি স্থানে আশ্রম তৈরী হতে থাকে। ৬০ বছর বা তারও কিছু বেশি বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ধর্ম বিষয়ে 'গুরু কি উপদেশ দিতেন' প্রশ্ন করলে শ্রীতাইন্দা রায় রিয়াং বলেন, গুরু বলতেন ''মুখে হরির নাম বল, মনে ধর্মরাখ, সৎকর্ম কর। অন্যের জিনিষ নিও না। পিতামাতাকে সমর্থন কর। পরিশ্রম করে খাও, নাম নিয়ে (নাম প্রচারের জন্য) সভা কর, গান কর। দল বড় কর, উদ্ধার হবে।''

দক্ষিণ মহারাণীর শ্রীমুকুন্দ রিয়াংকে প্রশ্ন করেছিলাম 'গুরুদেব' মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে কিছু বলেছেন কিনা? সরল আদিবাসী বাংলা ভাল বলতে পারেননা বলে উত্তরে বললেন: '' গান্ধীর কথা কইছে। ও কইছে। ইংরাজ ২০০ শত বৎসর রাজনীতি (রাজত্ব) করছে এখন চইলা যাইতে হইব। প্রজার রাজ্য হইব। রাজার রাজ্য থাকত না।''

কাঠালিয়ার (বগাফা বিলোনীয়া) চন্দ্রমনি রিয়াং সাধু প্রকৃতির লোক। ভাল গান করেন। পূর্ব পরিবেশিত গান দু'টি তিনিই গেয়েছিলেন একতারা বাজিয়ে। রতনমণি, ধর্মমত উপদেশ প্রভৃতি বিষয়ে তাকে এবং অন্যান্যকে প্রশ্ন করি। চন্দ্রমণি ধার্মিক লোক বলে ধর্মের উপদেশ ভালভাবে মনে রেখেছেন। তার বলা বাংলা হুবহু রেখে, শুধু ক্রিয়াপদ সামান্য বদল করে পরিবেশন করছি।

'' যুগ পরিবর্তন হইতেছে। ছয় সাগর তের নদী সাড়ে সাত হাজার মাইল দূরের রঘুনন্দন পর্বত হইতে নতুন অবতার আসিবেন। তোমরা সূর্য্যবংশী (কিন্তু) মূর্খ। তোমাদের লেখাপড়া নাই। বানরের মত থাক (বনে বনে ঘুড়ে বেড়াও)। নাম নিলে ধর্মজ্ঞান হবে। শিক্ষা জানবে। (তোমরা) রাজ্য চালাবে, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চার যুগ ধরে তোমরা মূর্খ। নাম নিলে জ্ঞান হবে। রাজা থাকবে না রাজত্ব থাকবে না ছোট আবার বড় হবে, (গরীবেরা) রাজত্ব চালাতে পারবে। এই সব টাকা পয়সা থাকবেনা। অত্যাচার থাকবে না। ধর্ম মুক্তির পথ দিবে। মন্ত্র মুক্তির পথ দিবে।''

'' মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, বাঙ্গাল, চাকমা, মুসলমান এক জাতি হবে। কিন্তু (তারা) আবার আলাদা জাত হবে। মানুষ কাটাকাটি মারামারি করে মরবে। বিলাত সরকার নিজে নিজে যাবে।

''তারা পাপ করুক মরুক। তুমি নাম ধর্ম (কর) রাতের পর দিন আসবে। অন্ধকার দূর হবে। নাম তোমাদের উদ্ধার করবে।

খুদা, যীশু, বুদ্ধ কত আছে। আমি রত্ন যীশুর মত। তোমাদের রতন যীশু। আমাকে আসামী (অবিশ্বাস) করলে পাপ হবে। দ্রব্যের অকাল

হবে। দেশে আগুন জ্বলবে।
নাম নিলে কি হয় - লুসাই মধ্যে (জম্পুই পাহাড়ে) যাও, দেখ। যীশুর নাম নিয়ে লুসাইরা এক হয়ে কেমন ভাল আছে। তাদের দেখে শিখ।
খগেন রায় (রায় কাঞ্চন) ধর্মের জন্য কিছু করে না সামাজিক অন্যায়ের জন্য (নামে) বিচার করে। নামের ('নাম' নেওয়ার) জন্য কিছু বলে না।
বোমা দিয়ে কামান দিয়ে তারা যুদ্ধ করবে। তোমরা গরীব, তোমরা তার মধ্যে যেও না। তোমরা বেঁচে থাকবে।''
প্রশ্ন করি - ''রায় বা চৌধুরীরা বিচার করার পর আপনারা নিশ্চয়ই গুরুদেবকে জানাতেন, তখন তিনি কি বলতেন?
চন্দ্রমণি উত্তর দেন, ''গুরুদেব বলতেন, সামাজিক নিয়া বেশী গন্ডগোল করিও না। সমাজ পরিবর্তন হইতেছে। তোমরা ছোট জিনিষ নিয়া পড়িয়া থাকিও না। নাম প্রচার কর। দল বড় কর। সব রিয়াংকে এক করিয়া রাখ। পাপ নিজে ধ্বংস হইবে।''
উদয়পুর থানার নায়েব দারোগা শ্রী দীনেশচন্দ্র দাসের সংগে রতনমণির সাক্ষাৎ হয় তুইছারুবুহা ক্যাম্পে ২৯ জুলাই ১৯৪৩ ইংরেজীর বিকেল বেলা। দীনেশ বাবু যে স্মৃতিচারণ করেছেন তা থেকে রতনমণির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া হল: '' আদি বাসীগণের মধ্যে রিয়াং সম্প্রদায় অত্যন্ত নিরীহ ও বোকা প্রকৃতির। ধর্ম ও ভগবান বিষয়ে তাদের ভাল জ্ঞান নেই দেখে আমি রিয়াংদের মধ্যে নাম প্রচারে ব্রতী হই। অনেক রিয়াং আমার শিষ্য হচ্ছে দেখে রাজদরবারে আমার বিরুদ্ধে বহু নালিশ গিয়েছে। আমি নাম দেওয়ার কাজে বিরত হইনি। রিয়াংগণও হয়নি। খগেন্দ্র রায় ও তার দল আমার শিষ্যদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও অবিচার করেছে। খগেন্দ্র রায় ও অন্যান্যরা আমার শিষ্যদের কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে। আমি তা'দিগকে ডেকে এনে জানতে চাই তারা ঐ অর্থ দিয়ে কি করেছেন? রিয়াং সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করেছে কিনা? যদি না করে থাকে তবে এ অর্থ দিয়ে কি করেছে? ভগবান গরীবের বন্ধু। গরীবকে রক্ষা করাই ধর্ম। ভগবান অন্যায় সহ্য করেন না।''
রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হতে উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন - ''আক্রোশমূলে রায় ও চৌধুরীকে আনবার চিন্তা আমি করিনি। কাকেও অযথা হয়রাণি না করার জন্য আমি শিষ্যগণকে বিশেষভাবে সাবধান করে

দিয়েছি।''

শ্রী রামপ্রসাদ রিয়াং ছিলেন বগাফা লক্ষ্মীছড়া অভিযানের একজন প্রধান বা সেনাপতি। তাকে প্রশ্ন করি - '' আপনারা লক্ষ্মীছড়া গেলেন (১/৯/৪৩ ইং) সেখানে গোলাগুলী হল; আপনারা পালিয়ে এলেন তুইছারুবুহাতে। গুরুদেবকে সব জানালে তখন গুরুদেব কি বললেন ?''

রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন '' গুরুদেব বললেন, সৈন্য এসেছে, তোমরা পারবে না। যে যার পালিয়ে আত্মরক্ষা কর।''

প্রশ্ন করি - 'আপনি কি বললেন' ?

রামপ্রসাদের উত্তর - '' গুরুদেব। তুমি থাক। তোমাকে মাঝে নিয়ে আমরা মরব।'' গুরুদেব রাজি হননি। সেনাপতির উপযুক্ত প্রস্তাব। সেই একই প্রশ্ন করেছিলো চন্দ্রমণিকে। তার উত্তর আমার এত ভাল লেগেছে যে কোন প্রকার কলম না চালিয়ে হুবহু তুলে দিলাম, সুধী পাঠকবৃন্দ একটু কষ্ট করে অর্থ উদ্ধার করে নেবেন। পাঠ সহজ করার জন্য বন্ধনীর ভেতরের শব্দ আমার দেয়া। সরল আদিবাসী, ভাল বাংলা জানে না। তথাপি গুরুর উপদেশ কত সহজ ভাবে মনে রেখেছেন তা লক্ষ্য করার মত।

সাধু চন্দ্রমণির উত্তর - ''গুরু কইছে (গুরুর কাছে বলি) আমরে (আমাদের) সকল আপত্তি (বিপদ) হইতেছে। রাত্রি মধ্যে পৌঁছে। যখন এখানে (সেখানে) গোলাগুলী হইছে অত (কত) মানুষ মরছে সেটা আমিও জানাজানি হয় নাই (জানিনা)। তোমার আশা করে কাজ করতাছি। অখন কি উপায় ? আমি ডরে (ভয়ে) এই রকম হইছে।

তখন গুরু কইছে - না শিষ্যগণ, তুমি চিন্তা হইবে না (করিবে না)। যুগে যুগে এরকম হয়। তোমরা সকলের মানাইত পারত না (বুঝাতে পারব না)। দেশ যদি দাবী করে, আইন যদি দাবী করে, রাজ্য রাজনীতি যদি দাবী করে, (তবে) যুগে যুগে এই রকম হয়। শাস্তিও হইতে পারে, কষ্টও হইতে পারে, সত্য যুগে শুক্রমণি গুরুরজন্ম হইছে, এই সময়ে (তখন) গোপাল গোবিন্দ হরিনাম নিয়া এই রকম হইছে।

''ত্রেতাযুগে বিশ্বমিত্র গুরুর জন্ম হইছে ওঁ প্রাণ রাম। এ সময়ে এই রকম হয়। দ্বাপরযুগে দ্রুণগুরুর জন্ম হইছে ওঁ তৎ সৎ প্রাণ: নয়ন: এ সময়ে এই রকম হয়।

এইত নিতাই নিমাই সন্যাস নিয়া- ওঁ রিং জিৎ কোলকাতা দিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেও এই রকম সন্ন্যাসীর কষ্ট হয়। তুমি কষ্ট কর শাস্তি ভোগ কর। এবারও তোমারে দিনের মত আকর্ষণ ভগবান দিব (ভগবান তোমাকে

রক্ষা করিবেন)।

যদি মহারাজ আমারে চিনে জগৎগুরু বইল্লা মহারাজ যদি চিনে, পরিচয় যদি জানে, তাহলে তোমারেও কিছু করত পারত না, আমারেও কিছু করত পারত না। যদি না জানে, আমারে গুরু বইল্লা যদি না জানে তাইলে ৭৯৩ রাজা ধ্বংস হইয়া যাইবে, ২৭টি উপাধি ধ্বংস হইয়া যাইব। হইলও এটা বল্লে সকলে একত্র একযোগ হইয়া ৯ কোটি সূর্য যেমন আকর্ষণ হয়, ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার চন্দ্র আকর্ষণ হয়, ৪০০ বৎসর রাস্তার ভগবান আকর্ষন হইলে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে সময় বস্ত্র দান করে লজ্জা নিবারণ করে। তোমরা এই রকম লজ্জা নিবারণ করতে পারব।

''আমার মুখে না, ঈশ্বর ভগবান আমার মুখ দিয়ে এই রকম কইতেছে।''

প্রশ্ন করি - গুরুদেব যাওয়ার সময় কি বল্লেন? তিনি কি বল্লেন, আমি যাই তোমরা এখানে থাক? চন্দ্রমণি - আমরা বল্লাম গুরুদেব তুমি যদি পলাইয়া যায়, আমিও পালাইতে লাগব। গুরুদেব তখন বল্লেন '' অখনত যার দিয়া যার জীবন রক্ষা করব। তোমার জীবন আমি রক্ষা করত পারি না। যার যার জীবন রক্ষা কর। আমি আশ্রম যাইতেছি। আমি আবার আইব। আমি মরব না। আমার আত্মা তোমাদিগকে রক্ষা করবে। একদিন ন্যায় বিচার হইবে।''

প্রশ্ন করি - আচ্ছা আপনারা কি জিজ্ঞেস করেননি কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন, কি করবেন? চন্দ্রমণি বলেন - '' 'হ'। গুরু কইছে কংগ্রেস কমিটি আইব আর্যসমাজ আইব খৃষ্টান আইব তাদের সংগে যোগ কর। লুসাইদের উপদেশ নিবে।''

রতনমণির ভবিষ্যত বাণী মিথ্যা হয়নি।

বিদ্রোহের কারণ, অভিমত ও আনুসংঙ্গীক

রিয়াং বিদ্রোহের দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৩৫৫ত্রিং (১৯৪৫ইং) সনের ২৩শে ভাদ্র তারিখে মহারাজ চারজন রাজকর্মচারীকে নিয়ে একটি বিশেষ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হতে থাকে, তার কারণ ও প্রতিকার এবং তাদের নৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থায় সর্বাধিক উন্নতি সাধনের উপায় নির্বাচন ক্রমে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য কমিটি বলা হয়।কমিটি রাজসরকারে রিপোর্ট পেশ করেছিল জানা যায়। কিন্তু সেই রিপোর্ট সংগ্রহ করা যায়নি। একজন লিখেছেন কমিটি খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষকে বিদ্রোহের কারণ বলে নির্ণয় করেছিল। সরকার নিযুক্ত কমিটি

দুর্ভিক্ষকে বিদ্রোহের কারণ বলে ঘোষণা করেছিল বিশ্বাস করা যায় না। জিতেন ঠাকুর এবং কুমার নন্দলাল এই দুইজন ঐ কমিটির সভ্য ছিলেন। আমার নিকট সাক্ষ্যে তারা দুর্ভিক্ষকে বিদ্রোহের একটি কারণ বলে স্বীকার করেনি। রতনমনির শিষ্যগণ ও খাদ্যাভাব বিদ্রোহের কারণ বলেন নি।

কেউ কেউ লিখেছেন এই অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছিল ''জনমঙ্গল'' এবং বা '' গণপরিষদের'' দাবী স্বীকার করে নিয়ে। ১৯৪৫ ইংসনের অন্তত অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ এবং শ্রী বীরেন দত্ত রাজবন্দী হিসাবে জেলে আটক ছিলেন। এ তথ্য আমার স্পষ্টমনে আছে। তাদেরপক্ষে এই ব্যাপারে দেওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। সুতরাং জনমঙ্গল বা গণ পরিষদের এই কমিটি গঠন বিষয়ে কোন অবদান নেই।

সংশ্লিষ্ট অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আগরতলায় কয়েক বার সাক্ষাৎ গ্রহণ করেছিলাম এর ফলে প্রাপ্ত তথ্য সংক্ষেপে দেওয়াহল।

ঠাকুর শ্রী জিতেন্দ্র দেববর্মা সেইকালে রাজসভার বিশেষ খাসদরবারী এবং রিয়াং বন্দী মুক্তি সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি বলেন, রতনমণির দল নানাভাবে খগেন রায় ও চৌধুরীদের বিরুদ্ধে তাহাদের পুঞ্জিভূত অভিযোগ মহারাজের গোচরে আনার চেষ্টা করেছে। মিসিপ হরচন্দ্র ঠাকুর রাজদরবারের বিশেষ খাস দরকারী এবং খগেন রায়ের সমর্থক ছিলেন। তাহার প্রভাবের জন্য মহারাজের নিকট হতে অভিযোগের প্রতিকার পাওয়া যায়নি। মহারাজের নিকট হতে প্রতি কার না পেয়ে রতনমণির শিষ্যগণ লুসাই চীফ রাংবুংহার নিকট অভিযোগ করে। মি: রাংবুং হা মহারাজের নিকট চিঠি দেন। সেই চিঠি পেয়ে মহারাজ অতি ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করেননি।

খগেন রায় এবং চৌধুরীগণ নানভাবে দরিদ্র রিয়াংদের নিকট হতে অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় বা জরিমানা আদায় করত। অনেক সামাজিক বিধান রায় ও চৌধুরীরা নিজেদের ক্ষেত্রে লঙঘন করত কিন্তু সেই নিয়ম লঙঘনের জন্য দরিদ্র রিয়াংদের জরিমানা করত। রিয়াং সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ রীতি সম্মত হলেও এক স্ত্রীর বর্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা দন্ডনীয় অপরাধ ছিল। কিন্তু অনেক চৌধুরী নিয়ম লঙঘন করেও খগেন রায়ের কাজে দন্ডনীয় হতেন না। দেবী সিং রায়ের পরিবর্তে মহারাজ কর্তৃক খগেন্দ্র চৌধুরীকে রায় কাঞ্চন মনোনীত করা হয়। কিন্তু রিয়াংদের প্রচলিত খানদান অর্থাৎ রীতিনীতি অনুযায়ী 'রায়' জীবিত থাকা কালে তাহাকে পরিবর্তন করার কোন নিয়ম ছিলনা। এই পরিবর্তন রিয়াংদের (রতন মনির শিষ্যদের) মনে বিশেষ আঘাত দেয়।

মনোরঞ্জন ঠাকুর উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেন অনেক চৌধুরী গরীব রিয়াংদের দিয়ে জমিজমা চাষ করাত কিন্তু উপযুক্ত মজুরী দিত না, ক্ষেত্রবিশেষে বেগার (অর্থাৎ বিনামজুরীতে কাজ করান) খাটান হত। জমিছাড়া অন্যান্য কাজকর্মেও বেগার খাটান হত ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জনরব ছিল রতনমনির আন্দোলনের সঙ্গে জাপানীদের যোগাযোগ আছে এবং জাপানের নিকট হতে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে। এই কারণে মহারাজ রতনমণির দলের প্রতি বিরূপ ছিলেন, মূলত রতনমণির দলের আন্দোলন ছিল চৌধুরীদের বিরুদ্ধে, রাজার বিরুদ্ধে তারা আন্দোলন করেনি।

রিয়াং সম্প্রদায়ে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ ও প্রতিকার কমিটির একজন সভ্যছিলেন কুমার নন্দ লাল দেববর্মা। তিনি উপরিউক্ত কারণ গুলির সমর্থন করেন। তিনি অশিক্ষা, অভাব দারিদ্র এবং খগেন রায় সহ এক শ্রেণীর সর্দারের অতিরিক্ত অবিচার ও অত্যাচারকে বিদ্রোহের কারণ বলে ব্যক্ত করেন।

রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রাচীন সামাজিক রীতি অতি ন্যায় সংগত এবং সুন্দর। অন্য সূত্র থেকে পাওয়া বিবরণে জানা যায় স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বিবাহ করা সমাজ সম্মত। কিন্তু বিধবাকে এক বৎসর সংযমের সঙ্গে অপেক্ষা করার পর বিবাহের অনুমতি দেওয়া হত। বিপত্নিক পুরুষের পক্ষে ও সেই একই নিয়ম প্রযুক্তছিল একস্ত্রীর বর্তমানে স্বামীর পুণ:বার বিবাহ যে নিষিদ্ধ তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিক রীতি সম্মত। কিন্তু স্ত্রী সম্মত না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ দন্ডনীয় অপরাধ। সমাজে ব্যভিচারের স্থান নেই। শাস্তি অতি গুরুতর। বিপত্নিক বয়স্কের জন্য বিধবা বিবাহ সমাজ সম্মত। বৃদ্ধের তরুনী ভার্য্যার বিধান নেই। হিন্দু শাস্ত্রের বিধানের চেয়ে অনেক বেশী মানবিক রিয়াং সম্প্রদায়ের প্রাচীন রীতিনীতি।

খগেন্দ্র রিয়াং চৌধুরী ও তাহার সহযোগী সমর্থক চৌধুরীদের প্রতি রতণমনির শিষ্যদের বহু অভিযোগ জমা হয়েছিল। কাঠালিয়ার রতনমণির শিষ্যদের নিকট পাওয়া তথ্য গুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ করা যায়। বিশেষ ভাবে রতনমনির শিষ্যদেরকে বিনাদোষে বা সামান্য অপরাধে কঠোর দৈহিক নির্যাতন অথবা আর্থিক জরিমানা করা হত। জরিমানার পরিমান দশ টাকা থেকে শুরু করে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। এইভাবে খগেন চৌধুরী ও তাহার সমর্থক চৌধুরী গণ ২০,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করে। বগাফার চিন্তামণি নামে এক অধিবাসী বলেন মোট ২০, ৪২৫ টাকা দশ

আনা ছয় পাই জরিমানা করা হয়েছিল। সামাজিক অপরাধের বিচারের নামেই এইসব জরিমানা আদায় করা হয়েছিল।

পূর্বে গঙ্গা পূজা বা বাসীপূজার চাঁদা ছিল ঘরপ্রতি দুই টাকা মাত্র। খগেন্দ্র চৌধুরী তাহা বৃদ্ধি করে ৪ টাকা চাঁদা আদায় করা শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে রতনমণি ও তার ভক্তদের রাজদ্রোহী জাপানের চর বলে রাজ সরকারে অভিযুক্ত করা হয়। রাজ্যরক্ষী বাহিনীর সাহায্যে কয়েদখাটান ও দৈহিক সাজা দেওয়া হয়।

মহারাজের নিকট অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। মহারাজ খগেন চৌধুরী ও তার সমর্থকদেরই সমর্থন করেছেন।

ত্রিপুর সেনের লেখা Tripura in Transition অনুযায়ী বাৎসরিক পৌষমেলার গোমতীর উৎস মুখে ডম্বুর কুন্ডে ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড নিয়ে প্রথমে ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে ও পরে চৌধুরীদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়।

শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র দত্ত তাহার ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহ প্রবন্ধে ঘর চুক্তি খাজনা বৃদ্ধিকে রিয়াং বিদ্রোহের একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরা সরকার ঐ সময়ে রিয়াংদের ঘর চুক্তি বাৎসরিক খাজনা পাঁচ টাকা হতে বৃদ্ধি করে নয় টাকা ধার্য্য করে। লেখক বগাফায় অনুসন্ধান কালে এর কোন সমর্থন পায় নি। এই কর বৃদ্ধির বিষয় বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয়গণ স্মরণ করতে পারেনি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয়ে রতনমণি অবগত ছিলেন এমন সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, ধর্ম গুরু হিসাবে ধর্মীয় নীতি বোধ দ্বারাই তিনি শিষ্যদের মনে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন।

রতনমণির দল যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্য করেনি বা রাজ্যরক্ষী বাহিনীতে যোগদান করেনি তাহার প্রধান কারণ নবশিক্ষায় শিক্ষিত খগেন রায় চৌধুরী ও তাহার সহযোগীদের কার্য্যকলাপ। খগেন রায়কে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাহারা রাজ- শক্তির রোষে পড়েছিল।

শ্রীদত্তের অভিমত ''দু:র্ভিক্ষজনক পরিস্থিতির জন্য রতনমণির শিষ্যগণ ধর্মগোলা' স্থাপন করেছিল। এ তথ্যের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। খগেন রায় এবং তাহার সমর্থক চৌধুরীদের বন্দী করে এনে বিচার করার সংকল্প নিয়েই কেম্পগুলি করা হয়েছিল, এবং এই প্রক্রিয়া বা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যই বসদ বা খাদ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়েছিল।

শ্রীদত্ত লিখেছেন '' যুদ্ধের প্রয়োজনে ত্রিপুরা রাজ্যরক্ষী বাহিনী চতুর্দশ দেবতার দল' প্রভৃতি সৈন্য বাহিনী গড়ে তোলা হয় ত্রিপুরী, জমাতিয়া , নোয়াতিয়া, রিয়াং, হালাম প্রভৃতি উপজাতীয় সমাজের যুবকদের নিয়ে।

এইসব সৈন্য বাহিনীতে ভর্ত্তির জন্য যুবকদেরকে সংগ্রহ করে আনতেন তাহাদের দফার সর্দ্দার ও চৌধুরীরা। রিয়াং যুবকদের সংগ্রহ করে আনার জন্য বগাফার চৌধুরী খগেন্দ্র চৌধুরীকে ভার দেওয়া হয়। এই গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে চৌধুরী মহাশয়ের নিজের ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৃদ্ধির সুযোগ আসে। তিনি রিয়াং সম্প্রদায়ের ''রায়'' বা প্রধানব্যক্তি হয়ে উঠতে সচেষ্ট হন। অথচ রিয়াং সমাজের নিয়ম অনুযায়ী এক রায়ের জীবিত কালে অন্য 'রায়' নিযুক্ত হতে পারেনা। নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে বগাফার চৌধুরী খগেন্দ্র রিয়াং তার সম্প্রদায়ের 'রায়' নিযুক্ত হন। মহারাজ অমরপুরের দেবী সিং রিয়াংকে 'রায়' পদ থেকে বরখাস্ত করেন। অনুমান করা কঠিন নয়, রিয়াং চৌধুরী সম্মেলনে নতুন রায়ের সংগে প্রাক্তণ রায়ের সমর্থকদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে উঠবে। রিয়াং সর্দ্দারদের সম্মেলনে নতুন রায় কর্ত্তৃক প্রাক্তণ রায় অপমানিত হন। ফলে রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মকলহ অনেকখানি শিকড় গেড়ে বসে। (উদিতি ৬ষ্ঠ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা ১৩৭৯ বাং)

দেবীসিং রিয়াং এর বাড়ি অমরপুরে নয়, বিলনীয়ার লক্ষ ছড়ায় ছিল। খগেন রায়ের উপর রিয়াং যুবকদের নিয়ে 'রাজ্য রক্ষী বাহিনী' গঠন করার দায়িত্ব ছিল। দেবী সিং রিয়াং এর সমর্থক বৃন্দের অনেকেই ছিলেন রতনমণির শিষ্য। রায় ছিলেন রিয়াংদের রাজা। প্রথা অনুযায়ী তাহার উজির নাজির এবং ভাবীরায় সহ এক রাজ পরিষদ মন্ডলী ছিল। তাহারা সকলেই ক্ষমতাচ্যুত হয়। খগেন রায় নিজের পছন্দ অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন। দুই দলের মধ্যে রেষারেষি এবং সংঘাত যে শুরু হবে তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। খগেন রায় রাজ্যরক্ষী বাহিনীতে সৈন্য বা সেচ্ছা সেবক সংগ্রহ করতে না পেরে সাধু রতনমণির প্রভাবকেই এর জন্য দায়ী করেন, এবং সেই ভাবেই রাজ্য সরকারে অভিযোগ প্রেরণ করতে থাকেন।

অন্যদিকে খগেন রায় এই মনোমালিন্যের পূর্ব হতেই বা পরে সমাজ সংস্কার মূলক কাজে হাত দেন। এ নিয়েও দু'পক্ষের দূরত্ব বৃদ্ধি হতে থাকে। খগেন রায়কে লক্ষ্য করেই হয়ত ১৯৩৬ সনে খুসীকৃষ্ণ নোয়াতিয়া ছাপানো গানের বইতে লিখেছিল - তোমার হৃদয় শূন্য। পায়ে জুতা পরেছ, হাতে ঘড়ি বেঁধেছ, মাথায় সুগন্ধী তেল মেখে কি আনন্দ পেয়েছ?

হাতি ঘোড়া চড়ে মহারথী হয়ে আর সুন্দর হতে চেয়োনা ইত্যাদি। গান খানি ১৯৩৬ইং সনে ছাপা হলেও গানটি এর বেশ কিছু কাল পূর্ব থেকেই রতন মনির প্রার্থনা সভায় এবং ভক্তদের ঘরে ঘরে গাওয়া শুরু হয়েছিল তা অত্যন্ত সহজেই অনুমান করা যায়। সম্ভবত এধরনের রচিত গীত হত। এসব গান যে তাহাকেই লক্ষ্য করে গীত হচ্ছে তাহা খগেন চৌধুরী অনুমান করেছিলেন, এবং সেজন্যই আরো কঠোর হয়ে নোয়াতিয়া সমাজের সাধুদের প্রভাব হতে রিয়াং সম্প্রদায়কে মুক্ত করার প্রচেষ্ঠা নিয়েছিলেন।

অমরপুরের গোমতীর উৎস মুখ ডুম্বুর জলপ্রপাত বা তীর্থমুখে পৌষ সংক্রান্তিতে অস্থি বিসর্জন, তর্পণ স্নান সহ মেলার ব্যাবস্থা বহু পূর্ব হতেই আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত ক্রিয়াকান্ড পূর্বে রিয়াং ওঝা বা পুরোহিতগনই সম্পন্ন করতেন। খগেন রায়ের নেতৃত্বে (সম্ভবত রায় হবার পূর্ব থেকেই) ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐসব কাজকর্ম সম্পন্ন করার বাস্তব কার্যক্রম শুরু হয়। রতন মনির শিষ্যদের অভিযোগ ব্রাহ্মণদের এই আয় থেকে খগেন চৌধুরীও কিছু অংশ গ্রহন করত। খগেন চৌধুরীর সাথে রতন মনির শিষ্যদের বিরোধ প্রকট হবার পর, তীর্থমুখের ক্রীয়াকর্মে রতন মনির শিষ্যগন অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং রতনমনির শিষ্য ওঝাদের দ্বারা পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করাবার সিদ্ধান্ত নেন। রিয়াং রাজদরবারে আলোচনা করার পর কোন সুরাহা হয়নি। সেই দরবার দেবী সিংহের আমলে অথবা খগেন রায়ের আমলে তাহা নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই। রতনমনির শিষ্যগন তখন থেকে রিয়াং সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অতিযত্নের সাথে প্রতিপালন ও রক্ষা করার কাজে ব্রতী হন।

খগেন রায় ও তার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।১৯৪৬-৪৭ইং সনের পৌষ মেলার সংক্রান্তির দিনে লেখক রতনমনির শিষ্যদের সাথে তীর্থমুখ পৌঁছে সেই উত্তেজনার সম্ভবনা লক্ষ্য করেছিল। সরকারের পাঠনো পুলিশ শান্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। যাই হোক কোন অপ্রিয় ঘটনা সেখানে ঘটেনি। এই ধর্মসংক্রান্ত বিরোধ ও বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ হল নোয়াতিয়া (ত্রিপুরা) সমাজের সাধু রতনমনি রিয়াং সম্প্রদায়ের উপর কতৃত্ব করবেন তাহা শিক্ষিত খগেন্দ্র চৌধুরী সহ্য করতে পারেননি। গুরু হিসাবে রতনমণিকে দেবতার আসনে বসানোয় খগেন চৌধুরীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।

১৯৫২-৫৩ইং সালের পর একবার লেখকের সাথে বগাফায় খগেন্দ্র চৌধুরীর দেখা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে অতিঅনগ্রসর

জমিজমার প্রতি মমতাহীন রিয়াং সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যই তিনি বেশ কিছু সংস্কার মূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। ধর্মকর্ম যাতে হিন্দু মতে হয় সে বিষয়ে তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। জমি বন্দোবস্ত দেওয়া, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং সৈন্যবাহিনী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সহ বিভিন্ন সরকারী কাজে রিয়াং যুবকদের চাকুরী পাওয়ার বিষয়ে তিনি প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষ আন্দোলন করে তাহার সবরকমের প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। খগেন চৌধুরীর মতে সমাজকে যুগপোযোগী করে তৈরী করার প্রচেষ্টায় পুরাতন পন্থীরা, রতনমনির সহযোগে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

মহারাজের প্রথমে নীরবতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে কঠোর মনোভাবও বিদ্রোহের একটি কারণ। জীতেন ঠাকুর মহাশয় এক সাক্ষাতকারে লেখককে বলেছিলেন, একদিন রাজদরবারে তিনি যখন উপস্থিত ছিলেন সেই সময়ই রতনমনিকে রাজদরবারে মহারাজের সামনে উপস্থিত করা হয়। তাহার সেই সময়ে রতনমনির বিষয়ে কোন উৎসুখ্য না থাকায় তিনি মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনেন নি। মহারাজ যে রতনমনিকে প্রকৃত সাধু মনে করে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন সে বিষয় তাহার সম্পুর্ণ মনে আছে। পরবর্তী সময়ে লুসাই চীফ এর পত্র পেয়ে মহারাজ রতনমনির দলের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং রিয়াংদের অভিযোগের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা (বিদ্রোহ দমনে অংশ গ্রহনকারী লেপ্টেনেন্ট এবং প্রবন্ধ লেখক) এই লেখককে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে মহারাজ তৎকালীন যুদ্ধরত বৃটিশ মিলিটারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে চিঠি পেয়ে, রতনমনির শিষ্য বা সমর্থকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা নেন। দারোগা দীনেশ বাবুকে বন্দী না করা হলেও রিয়াংদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত। যদিও এবিষয়ে লিখিত দলিল হস্তগত হয়নি তথাপি অন্যভাবে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯৪৭ইং সনে তথ্যানুষ্কান কালে লেখক উদয়পুরের তৎকালীন (১৯৪৩) এস ডি ও মহাশয়েরও সাক্ষাতকার নিয়েছিল। তাহার বক্তব্যে জানা যায় যে রিয়াং ডাকাতদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়ার কিছুকাল পূর্বে চার পাঁচ জন বিদেশী সৈন্য (বৃটিশ বা আমেরিকান) উদয়পুরে তাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা চট্টগ্রামের কোন অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে ডুম্বুর প্রভৃতি অঞ্চল হয়ে উদয়পুরে পৌঁছেছিল। তাহারা রিয়াং দের কিছু অশান্ত কার্যকলাপের বিবরণ দেয়।

যাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজদরবারে প্রেরণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল হয়ে যাওয়ায় সাহেবদের দেওয়া বিবরণের বিষয় বস্তু তাহার স্মরণ নেই। ঐদিনই তাহারা কুমিল্লা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি জানান।

বীরেন দত্ত '' আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিওনিষ্ট ও গনতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমি'' পুস্তকে লিখেছিলেন ' বৃটিশ কমিওনিষ্ট পার্টির সভ্য রিয়াং বিদ্রোহের প্রাথমিক বিস্তৃত বিবরণ কমিওনিষ্ট পার্টির কুমিল্ল জেলা কমিটির অফিসে পৌছে দিয়েছিলেন। বক্তব্যের উৎস বিষয়ে তিনি কোন বিবরণ বহিতে দেন নি। রিয়াং বিদ্রোহের প্রাথমিক বিবরণ বৃটিশ কমিওনিষ্ট পার্টির সভ্য কুমিল্লার পার্টি অফিসে পৌছে দেবার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়না। লেখকের নিকট ইহা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। লেখকের ধারণা তৎকালীন উদয়পুরের এস ডি ও'র নিকট সাহেবদের বিবরণই পল্লাবিত হয়ে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে বীরেন দত্ত মহাশয়ের নিকট পৌছেছিল। মনে রাখতে হবে যে বীরেন বাবু ১৯৪২-৪৩ইং সালে জেলে রাজনৈতিক কারনে বন্দী ছিলেন।

বিদ্রোহের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাজকীয় কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণের কথাও উল্লেখ করতে হয়। বিভিন্ন সূত্রথেকে পাওয়া সংবাদ বা রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকার বা মহারাজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল। রতনমণির শিষ্যদের বিরুদ্ধে খগেন্দ্র চৌধুরীও তার সমর্থকদের অভিযোগের সংগে যুক্ত হল বৃটিশ মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষের দেওয়া গোপন সূত্রে পাওয়া রিয়াংদের অশান্ত বিদ্রোহীসুলভ কার্য্যকলাপের বিবরণ। সেই সময় চট্টগ্রাম, নাগাল্যান্ড ও মণিপুর সীমান্তে জাপানী এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী এক যোগে আক্রমণ করে মিত্র বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। সেই অবস্থায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর এজেন্ট প্রভোকেটার বা পঞ্চম বাহিনীর সংগে রতনমণির যোগাযোগের সন্দেহ করা অস্বাভাবিক নয়। আজান্দ হিন্দ বাহিনীর সংগে রতনমণির যোগাযোগ সন্দেহ করেই স্থানীয় বৃটিশ মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষ মহারাজকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে থাকবেন। সেই প্রস্তুতিপর্বেই রাজসরকারে সংবাদ আসে উদয়পুর থানার দারোগা বাবু অনুসন্ধানে রত থাকার কালে রতনমণির শিষ্যদের হাতে বন্দী। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি! সরকারের সংগে পাঞ্জা ধরার সাহস! ডাকাত্ দলকে সায়েস্তা করতে কঠোর আদেশ দিতে বাধ্য হলেন মহারাজ। রতনমণির আগরতলার শিষ্য বা সমর্থকবৃন্দ ও রতনমণির শিষ্যদের উপদেশ সহ নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে। মন্ত্রী তাইন্দা রায় রিয়াং-এর ক্ষুদ্র

বিবৃতিটি অতিমূল্যবান। রতনমণির তরফ থেকে রায়ের সংগে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা হয়েছে, সেই প্রমান পাওয়ায়। মিটমাটের জন্য লুসাই চীফ এর পুত্র কে,টি, চাওমা কে নিয়ে ২৫ জন সহ খগেন্দ্র রায়ের সংগে সাক্ষাৎ আলোচনা করে। খগেন 'রায়' মিটমাটের কোন শর্তেই রাজি হন নি। অধিক তাঁহার অভিযোগ মূলে ১৯৪৩ সনের প্রথম দিকে (ফেব্রুয়ারী) খুসীকৃষ্ণ হান্দাই সিং ও কান্ত রায়কে আগরতলার আলং বন্দী খানায় আটক রাখা হয়। আলং বা বন্দী খানা ছিল মহারাজের খাস তত্ত্বাবধানে উপজাতি অভিযুক্তদের বা সাজাপ্রাপ্তদের কয়েদখানা। সেখানে ৪৮ দিন বন্দী থাকার পর ঐ তিন জন মুক্তি পায়। ব্রজলাল কর্ত্তা মুক্তি দেন। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে এই মুক্তি আদায়ের পেছনে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির প্রচেষ্টা ছিল। রতনমণির আগরতলার সমর্থক বৃন্দই সম্ভবত: ব্রজলাল কর্ত্তাকে প্রভাবিত করে এ তিনজনের মুক্তি আদায় করেছিল এবং ঐ সমর্থক গণই ব্রজলাল কর্ত্তার নাম করে নিজেদের মধ্যেই বিচার বা মিটমাটের জন্য উৎসাহিত করেছিল অথবা খগেন রায়কে উচিত শিক্ষা দিতে প্ররোচিত করেছিল।

রিয়াংদের প্রভাবশালী মিসিপ লে: হরচন্দ্র দেববর্মার সমর্থন না পেলেও রতনমণি বা তাঁর দলের প্রতি আগরতলার 'ঠাকুর' শ্রেনীর কিছুসংখ্যক লোকের সমর্থন ও সহানুভূতি যে ছিল তার প্রমান পাওয়া যায়। ১৬/৪/৫৩ ত্রিং আগরতলা কতোয়ালী থানার ও.সি. আদেশ অনুযায়ী শ্রী ভুবনজয় দেববর্মাকে মহেশপুরের সুখিয়া সাধুর বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে। তার শ্যালক শ্রী বৈকুণ্ঠ চন্দ্র দেববর্মাকে, পূর্বাহ্নে গ্রেফতারের সংবাদ জানানোর অভিযোগে বডিগার্ড বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এবং এই চিঠিপত্র রতনমণি সংক্রান্ত ফাইলে থাকায় বুঝা যায় গ্রেফতারকারীর সংগে বিদ্রোহীদের যোগ আছে।

দীনেশ বাবুর বিবৃতিতে দেখা যায় রতনমণির বিনন্দিয়া গারদ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে শ্রী ভ্রমর দেববর্মার হাত ছিল। আগরতলার মধ্যেও রতনমণির বেশ কয়েকজন শিষ্য ছিল বলে কোন কোন রিয়াং বিদ্রোহী নেতা দাবী করেন। তিন জন আগরতলায় আলং কয়েদ খানায় ৪৮ দিন আটক থাকার পর মুক্তি পায়। ব্রজলাল কর্তার অথবা সমর্থকদের উৎসাহ পেয়ে বা অন্য কারণে সরল অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত আদিবাসী রিয়াংগণ বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য নিজেরাই বদ্ধপরিকর হন এবং যে কোন উপায়ে রায় ও চৌধুরীদের বিচার ও সাজা দেওয়ার

জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

ঐ তিনজন আগরতলা হতে মুক্ত হয়ে আসার পর তাদের প্রতিবেদন পেয়ে রিয়াং সংগঠন বিপ্লবাত্মক রূপ নেয়। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত তার বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়। মহারাজ কর্তৃক নিযুক্ত 'রায় কাঞ্চন'কে তারা ডেকে এনে বিচার করবে। রায় কাঞ্চন ও অভিযুক্ত চৌধুরীরা যদি আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে তাদের জোর করে ধরে আনা হবে এবং বিচার হবে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বেশ কিছুসংখ্যক চৌধুরী ও সর্দার রতনমণির দলভুক্ত বা সমর্থক ছিল।

সেই সিদ্ধান্তই তারা ঘটনার মাস দুই পূর্বে নেন। মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হয়েছিল সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য। মন্ত্রীপরিষদের অর্থ হচ্ছে বিকল্প সরকার। তদানীন্তন সরকারের কাছ থেকে ন্যায় বিচার না পাওয়ার জন্যই তারা বিকল্প সরকার গঠন করেন। স্বভাবতই: রতনমণিকে শিষ্যগণ রাজ মর্যাদা দেন, আইনত: প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ ও তাদের কার্যাবলী বিদ্রোহের সামিল। মহারাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ না থাকলেও বা মৌখিক আনুগত্য দেখাবার চেষ্টা করলেও কার্যত: তাদের সিদ্ধান্ত রাজদ্রোহমূলক। যদিও রতনমণির দলের সব অভিযোগ খগেন রায়ের বিরুদ্ধে তথাপি মহারাজ কর্তৃক নিযুক্ত অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রায় কাঞ্চনকে অস্বীকার করে মহারাজের সার্বভৌমত্বের উপর তারা আঘাত করেছেন।

আন্দোলন বা বিদ্রোহের উদ্ভব এভাবেই ঘটে। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনও শুরু হয়েছিল আংশিক সুখ সুবিধার জন্য আবেদন নিবেদনের ডালি নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার আন্দোলন ও বিদ্রোহের বা বিপ্লবের রূপ নেয়। রিয়াংদের জগৎ তাদের জুমচাষ ও রায় কাঞ্চনকে কেন্দ্র করে। রায়কাঞ্চন তাদের custom and traditionকে রক্ষা করে ন্যায় বিচার করবে। গুরু রতনমণির ধর্ম বিতরণের প্রভাবে তারা সমাজ এবং জগতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে। এতদিন যে অন্যায় ও অবিচারকে বোবার মত সহ্য করেছিল আজ তাকে অন্যায় জেনে অন্যায় বলতে আরম্ভ করেছে। গুরুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নতুন ভাবে সমাজ প্রতিষ্ঠায় তারা ব্রতী হতে চায়। রায়ের কাছে আবেদন করেছে, ফলে রায় দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। মহারাজের কাছে আবেদন করেও ফল হয়নি।

তাদের স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী কাজ করছে রায় কাঞ্চন। গুরুর নির্দেশ

বা উপদেশে যা তারা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করছেন সে কাজ করার অধিকার তারা পাচ্ছে না। তাদের প্রাপ্য সামাজিক অধিকার বা স্বাধীনতা বিপন্ন। রিয়াংরা নতুনভাবে তাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যেখানে রায়-এর অত্যাচার থাকবে না, অবিচার থাকবে না। এ আন্দোলন রিয়াংদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যদিও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগে এই আন্দোলনের সরাসরি যোগাযোগের নিদর্শন পাওয়া যায় না তথাপি এই আন্দোলনের মূল সূত্র এক সুরে বাঁধা। এখানে আদিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে পশ্চাদপদ রিয়াংগণ বন্ধন হতে মুক্তি ও রিয়াং সম্প্রদায়ের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা চায়। আবেদন নিবেদন করে তা যখন পাওয়া গেল না তখন বিদ্রোহ করা ছাড়া আর উপায় কি?

আন্দোলনকারীদের অনেকেই লেখাপড়া জানেন না। অধিকাংশই ভাল বাংলাও বলতে পারেন না। তথাপি এই আন্দোলনের প্রস্তুতি ও পরিণতি বিষয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট মতবাদ বা জীবনদর্শন ছিল বলেই মনে হয়. যদিও অনেকের নিকট হয়ত Premitive বলে মনে হতে পারে। সেই নতুন মতবাদের অধিকাংশ বা সম্পূর্ণই হয়ত গুরুদেব রতনমণির কাছ থেকে পাওয়া। তাদের লেখাপড়া জানা লোকের অভাব হেতু আমরা সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অন্যথায় বারদৌলি সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চেয়ে এর গুরুত্ব কম নয়। সেক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহ এখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুধু ছিল না তাদের সময়োচিত প্রচারব্যবস্থা বা বৃহত্তর জনসাধারণকে তাদের আন্দোলনের কারণ বা গতি প্রকৃতি বিষয়ে অবগত করানোর ব্যবস্থা। তথাপি ত্রিপুরায় জনসাধারণ এই আন্দোলনকারীদের নামকরণ করেছেন ঐ সময় 'স্বদেশী দল'।

ভারতের দেশীয় রাজ্যের তৎকালীন প্রজা আন্দোলনের মূলদাবী ছিল **জনপ্রতিনিধি মূলক সরকার, অর্থাৎ মহারাজা থাকবেন নিয়মতান্ত্রিক** প্রতিভূ হিসেবে, রাজ্য পরিচালনা করবেন জনসাধারণের পক্ষে বিধান সভা ও মন্ত্রীমন্ডলী। এখানে রিয়াং সম্প্রদায়ের দাবী ছিল তাদের রায় কাঞ্চন যদি অন্যায় বা ভুল করে তবে তাকে পরিবর্তন করার অধিকার। রায় শুধু মহারাজার দ্বারা মনোনীত হলে হবে না তাকে নির্বাচিত হতে হবে অধিকাংশ রিয়াংদের সমর্থনে। এখানে রিয়াং সম্প্রদায় চেয়েছিল জন প্রতিনিধি মূলক সর্দ্দার বা রায় কাঞ্চন। তাহাদের দাবী ছিল রিয়াং সম্প্রদায়ের যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ব্যবস্থার পুন: প্রবর্তন। অন্যান্য দেশীয়

রাজ্যের আন্দোলনের সংগে পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্য সর্ব সম্প্রদায়ের লোক সমবেত ভাবে দাবী করে ছিল রাজনিয়ন্ত্রণে গণতান্ত্রিক অধিকার। রিয়াং সম্প্রদায়ের দাবী শুধু নিজস্ব সম্প্রদায়ের অত্যাচারী রাজা বা রায়ের পরিবর্তনের অধিকার।

উদয়পুর হতে মহারাজের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরীর লেখা চিঠিখানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐ আবেদনে দারোগা বাবু রাজপ্রসাদ চৌধুরী ও অন্যান্যদের বন্দী অবস্থার কথা জানিয়ে লিখছেন '' ধৃত ব্যক্তিগণকে রতনমণি সাধুর নিকট বলিদান করা হইবে বলিয়াও নাকি রতনমণির শিষ্যগণ অপপ্রচার করিতেছে।'' দীনেশ বাবুকে রতনমণির আদেশে মুক্তি দেওয়া হইলেও রাজপ্রসাদকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাকে বিচার করে সাজা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাকে যাতে মারধোর করা না হয় সেজন্য রতনমণির বিশেষ নির্দেশ ছিল। এক শিষ্যের বক্তব্য অনুযায়ী রাজ প্রসাদকে বাঁশের ঘের দেওয়া কারাগারে সারাদিন রৌদ্রে ও বৃষ্টির মধ্যে আটক রাখা হয়েছিল। রাজপ্রসাদকে হত্যা করা হয়নি। সাধু রতনমণি কঠোর কায়িক শাস্তির বিরুদ্ধে ছিলেন। বলি দেওয়ার প্রচার যে অতিরঞ্জিত তা লেখাই বাহুল্য।

রতনমণি ছিলেন প্রকৃত সাধু। বিশেষ ভক্ত শিষ্যদের নিকট তিনি রত্নযিষু।

প্রকাশিত আদেশ ও চিঠিপত্র

মণিময় দেববর্মণ রচিত ''একটি বিতর্কিত চরিত্র - রিয়াং বিদ্রোহী নেতা রতনমণি'' (যা 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল) তে ব্যবহৃত অধিকাংশ সরকারী চিঠির প্রতিলিপি

চিঠি নং -১

সেহা নং ১৪২ তাং ১৪/৪/৫৩ ত্রিং (৪৩ ইং)

মঞ্জুর করা যায়

(মহারাজ শ্রীশ্রী বীরবিক্রম কিশোরের স্বাক্ষর)

উদয়পুর, অমরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সশস্ত্র ডাকাতদল ধৃত করা ও সায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে শ্রী শ্রী যুত সাক্ষাতের আদেশ অনুসারে অদ্য নিলিখিত রূপ সৈনিক ও অফিসারগণ লে: শ্রী নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বাধীনে রাজধানী হইতে উপদ্রুত অঞ্চলে রওয়ানা হইতেছে - বডিগার্ড জমাদার (১) শ্রী রমেশ চন্দ্র দেব (২) শ্রী প্রভাত চন্দ্র দেব। বর্ডিগার্ড আদার র‍্যাঙ্ক ৩০ জন। ২ নং ত্রিপুরা ইনফ্রেন্টির আদার র‍্যাঙ্ক ২ সেকসন। এদত অতিরিক্ত, রাজ্যরক্ষী বাহিনীর ও কতিপয় রিয়াং ও সর্দ্দার এবং শাসন বিভাগ হইতে সেনাদলের সাহায্যার্থ পুলিশ মোতায়েন করা হইবে বলিয়াও আদেশ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত ডাকাত দলকে দৃত করার ও সায়েস্তা করিবার কার্য্যে মোতায়েন থাকাকালিন ফোর্স কমান্ডার স্বরূপ লে: নগেন্দ্র দেববর্মার প্রতি শ্রী শ্রী যুত সাক্ষাতের অভিপ্রায় হইলে নিবর্ণিত রূপ আদেশ দেওয়া যাইতে পারে:-

১। মোতায়েমী ফোর্স ডাকাত দলকে ধৃত করিয়া রাজধানী আনয়ন করিবে।

২। কোন ডাকাত বা ডাকাত দলকে ধৃত করিবার কালে যদি কোন প্রকার বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ফোর্স কমান্ডারকে প্রয়োজন ও নিজ বিবেচনা অনুসারে স্বীয় জিম্বার কার্য্য আদায় করিবার জন্য ডাকাত দলকে কণ্ট্রোল করিয়া ফায়ার করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারিবে। ফোর্স কমান্ডার অতিরিক্ত ফোর্সের জমাদার গণকেও (ফায়ার) করিবার এবং সৈন্যগণকে সেলফ ডিফেন্সে ফায়ার করিবার আদেশ দেওয়া যাইতে পারে।

৩। ফোর্স মুভ করিবার সময় কোনও সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলকে ফোর্সের কার্য্যে বাধা দেওয়ার প্রতীয়মান হইলে ফোর্স কমান্ডার স্বীয় বিবেচনা অনুসারে উক্ত সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলের উপর আত্মসমর্পনের সুযোগ দিয়া ফায়ার করিতে পারিবে।

(৪) ডাকাতদলের বন্দুক গোলা বারুদ দাও বল্লম প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্ত্রাদি সংগ্রহ ও বাজেয়াপ্ত করিয়া আনিতে পারিবে।

(৫) ডাকাত দলকে বাড়ীতে বা পাড়ায় পাওয়া না গেলে ফোর্স তাহাদিগের বাড়িতে গিয়া ধান চাউল শিশু বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে বাহির হইবার সময় দিয়া, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহাদের বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিবে এবং ডাকাত দল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের পিতা মাতা প্রভৃতিকে বিবেচনা অনুযায়ী ধৃত করিয়া রাজধানী লইয়া আসিবে।

(৬) ফোর্স কমান্ডারের নিকট ফোর্সের রসদের জন্য এবং অন্যান্য কার্য্য উপলক্ষে টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। ঐ কার্য্যাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় আবশ্যক হইলে ফোর্স কমান্ডার উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগীয় অফিস হইতে প্রয়োজন স্থলে উপযুক্ত পরিমান টাকা হাওলাত ও গ্রহণ করিতে পারিবে।

বিহিতাদেশ প্রার্থনায় শ্রীশ্রী যুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর সাক্ষাত পেশ হয়।

ইতি ১৩/৪/১৩৫৩ ত্রিং

Sd/ B.L. Debbarman

Major O/C His Hijhness's Body guard.

চিঠি নং- ২

To,
The Commissioner of Police,
Tripura State, Agartala.
A batch of Military Troops will very soon be going to Amarpur area under order of His Highness the Maharaja Manikya Bahadur. Please depute 2 constables and I S I, Or A S I with party on the date required by Major Kumar B.L. Debverman Bahadur whom you are requested to consult.
By order
Sd/- P. Bhattacharjee
Chief Secretary to His Highness the Maharaja manikya Bahadur.

No. 300/c Dated 10.4.53
Copy forwarded to:
Major Kumar B.L. Debvarman Bahadur for information and favour of necessary action.
Sd/- P. Bhattacharjee,
Chief Secratary to His Highness.

চিঠি নং-৩

সেহা নং - ১৪১/১৪/৪/৫৩ ত্রিং
বিলোনীয়া বিভাগীয় অঞ্চলে ডাকাতের দল ধৃত করা ও শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রী যুত সাক্ষাতের আদেশানুসারে অদ্য নিম্নলিখিত রূপ সৈনিক ও অফিসারগণ লে: কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বাহাদুরের নেতৃত্বাধীনে রাজধানী হইতে উপদ্রুত অঞ্চলে রওনা হইতেছেন:-
বডিগার্ড - শ্রীব্রজ কুমার দেববর্মা।
বডিগার্ড আদার ব্যাঙ্ক - ২ সেকসন।
২ নং ত্রিপুরা ইনফেন্ট্রির জমাদার শ্রী বীরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা পূর্ব মোতায়নী ২ সেকসন সৈনিক উদয়প্র ও অমরপুর হইতে গ্রহনক্রমে মুহুরীপুর অভিমুখে রওনা হইয়া কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা

বাহাদুরের সংগে মহুরীপুর মিলিত হইয়া তাহার নেতৃত্বাধীনে থাকিয়া কার্য করিবে। এতদতিরিক্ত রাজ্যরক্ষী বাহিনীর অফিসার ও কতিপয় ত্রিপুরী ও রিয়াং সর্দ্দার এবং শাসন বিভাগ হইতে সেনাদলের সাহায্যার্থে পুলিশ অফিসার ও পুলিশ মোতায়েন করা হইবে বলিয়াও আদেশ জ্ঞাত হওয়া গিয়েছে।

ইতি- ১৪/৪/৫৩ ইং

Sd/- B.L. Deb Barman,
O/C His Highness
Body guards.

চিঠি নং- ৪

Massage Form.
From O/C B.G.I
Originators No 9
Dated 22.4.53
To
Udaipur
H H commanded that all Reangs under arrest with Krishna Dayal S/O Khusikrishna Noatia to be sent hare with ascort.
All arms with articles seared by R/R and B.G.I. to be sent to B.G.I. Office direct with proper list. If further prisoners in your Evision should also be sent.
Sd
OC. B.G.I.
Origin 17-30 hrs.

চিঠি নং - ৫

To,
Major Kumar Brajalal Deb Barman Bahadur,
Agartala, Tripura State.
Dear Sir,

I have the honour to invite your attention to the fact that 18 tins of patrol along with tins were taken by you on 30/7/43 as Hawlat from the A R P Stock, I regret to say that you have not returned the patrol and the tins yet.
I therefore request the favour of your returning the same at a very early date. Petrol will be available here in a day or two.
Your's Sincerely
Sd/ G.R.Dutta
15/8/43
Commissioner of Police
Tripura State, Agartala

অনুমান হয় আগরতলা হতে উদয়পুর সৈন্যদের মোটরের রাস্তায় প্রেরণ করার জন্য ঐ পেট্রোল ধার করা হয়ে ছিল। যুদ্ধের সেইসময়ে পেট্রোল রেশন ছিল। হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় পুলিশের নিকট হতে ধার নেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত: সেই কারণেই চিঠিটি এই ফাইলে এসে গিয়েছিল। মণিময়বাবু তাহার লেখায় প্রশ্ন করেছিলেন, এই পেট্রোল কি রিয়াংদের বাড়ীঘর পোড়াবার জন্য নেওয়া হয়েছিল কিনা। ছনবাসের বাড়ীঘর পোড়াবার জন্য দেশলাই-এর কাঠিই যথেষ্ট। - লেখক)

চিঠি নং- ৬

From Bikrampur Camp
Dated 24.4.53 TE
2nd Tripura JANGI INFENTRY
No. 1 Platoon

To,
The O/C Major Kumar
B.L. Deb Barman Bahajur
H.H. Body guards.

আজ্ঞাধীনের সবিনয় নিবেদন এই মাননীয় শ্রীযুক্ত হুজুর বাহাদুর ১৮/৪/৫৩ ত্রিং তারিখের আজ্ঞাধীনকে লিখিত অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল

যে, যদি কোন টাকা পয়সার দরকার হয় তবে অমরপুরের এস.ডি.ও-এর নিকট হইতে হাওলাত গ্রহণ করিতে পারিবে। আজ্ঞাধীন মাননীয় এস,ডি,ও-এর নিকট টাকা হওলাত চাহিয়াছিলাম। কিন্তু এস.ডি.ও.-এর নিকট টাকা না থাকা সত্ত্বে H.H. Body guard - জমাদার শ্রীযুত রমেশ চন্দ্র দেববর্মার নিকট হইতে মং ১০০ (একশত) টাকা হাওলাত গ্রহন করিয়া মাননীয় শ্রীযুত নগেন্দ্র দেববর্মার (2nd L/T) H.H. Body guard আদেশ অনুযায়ী নতুন বাজার, তীর্থমুখ, সিংনাবাড়ী, মটরাই চৌধুরী একসরী বাড়ী দস্যুদলকে ধরিবার জন্য যাইতেছে। গোচরার্থে নিবেদন।

ইতি- ২৪/৪/৫৩ ইং ত্রিং

নিবেদক

U.K. Debbarman , Jamadar.

চিঠি নং- ৭

Pad
Tripura, Place Sultanat Office, Agartala
Rly, Station, Akhaura
B A Pg
টাইম ১২-৩৫ ২৬/৪/৫৩ ত্রিং
ক্যাম্প - অভয়পাড়া
দুপুর!

নাইশা রায় ছড়ার ডুম্বুর, গংত্রাসছড়া ডুম্বুর, মহারাণী ছড়ার ডুম্বুর, যে স্থানে সেই দস্যু দলের মস্ত একটি ডিফেন্স নিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় টিলার উপর দিয়ে যাওয়ায় কোন কিছু করিতে পারে নাই। দস্যুদলের উপর বহু সাবধান - এখনও ভাল আছে - মহারাজের জয় দাও তবু তাহারা নানা কথা বলিয়া বসিয়া থাকে। তখন প্রথমে উপরের দিকে ফায়ার করি তৎপর ৩ নং হইতে পালাইতে থাকে কিন্তু একজন লোক ''তাইন্দুল'' নামক রিয়াং বন্দুক নিয়া ফায়ার করার জন্য তৈয়ার থাকে তবে তাহাকে ফায়ার করিয়া মরিয়া ফেলিয়াছি। তৎপর দৌড়াইয়া তাহাদের পোষ্টের জন্য আগাইতে থাকি, তৎপর শিলরাম নামক একটি রিয়াং বর্ত্তমানে সেও রাজা নামে অভিহিত তাহাকে ধরি ও তাহার সাহায্যেই পুরুষ ১১০ জন, মেয়েলোক ১২২ জন, ছেলে মেয়ে ২৩২ জন সর্বমোট ৪৬৪ জন ধরি।

সাতটি ক্যাপদার বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে মনোরঞ্জন ঠাকুরের নিকট ছয়টি ও একটি পুলিশ ইন্সপেক্টরের নিকট বুঝিয়া দিয়াছি দা ৯৪টি, কাচি ৭টি তাহাও মনোরঞ্জন ঠাকুরের নিকট দিয়াছি। আর একটি তলোয়ারও দিয়াছি। এ ক্যাম্পে ত্যাংখারায়, হান্দাই সিং, কাঠাল রায়, এ সমস্ত মন্ত্রী ছিল কিন্তু তাহারা কোথায় কোন ডুম্বুরে পালাইয়াছে, পাওয়া যায় নাই। তাহাদের ধরবার জন্য অনুসন্ধানে আছি। উক্ত লোকগুলির মধ্যে শিল রায়, সালেহ্য, শিখরাম এরূপ অনেক আসামী পাওয়া গিয়াছে। মনোরঞ্জন ঠাকুরের রিপোর্টে বিস্তারিত খবর পাইবেন। বাকী আসামীগুলিকে ধরার জন্য ৪ নং ও ৯ নং বাহিনীর অধ্যক্ষগণ চেষ্টা করিতেছে। এবং আসামীগণের পাহারার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে।

২) নির্দ্দেশ - চারিজন পুরুষকে মেয়েদের গাইড করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইলে ও মেয়েলোকগণকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য শ্রী শ্রী যুতের আদেশ থাকায় অভয় বাড়ী পর্য্যন্ত আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

(৩) দস্যুদল আমাদের সংগে বাস্তবিকই ফাইট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। তবে আমাদের সাবধানতার জন্য কোন কিছু করিতে পারে নাই।

(৪) ইন্সপেক্টার সুরেন্দ্র মজুমদার নতুন বাজার হইতে আমাদের সংগ ছাড়িয়া পুনরায় সাকল্যাইয়া পাড়ায় Join করিয়া আবার কালী কুমার চৌধুরীর বাড়ির অভিমুখে রওনা হইয়াছে। তাহার কোন রূপ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। সব সময় আমাদের সংগে থাকার কথা ছিল।

(৫) যে লোকটির উপরগুলি করা হইয়াছিল যে লোকটিকে First Aid করা হইয়াছিল - উদয়পুরের কম্পাউন্ডার বাবু তৎক্ষনাৎ ব্যান্ডেজ বাধে কিন্তু উরুট সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর বাচে নাই।

(৬) অদ্য আমরা অভয় পাড়া আসিয়া জানিতে পারিলাম শ্রী শ্রী যুত আগরতলায় চলিয়া গিয়াছেন। তাই পুনরায় অমরপুর (বিক্রমপুর) অভিমুখে রওনা হইতেছি। নতুবা উদয়পুরেই শ্রী শ্রী যুতের পাদপদ্মে ৪৬৪ জন লোককে পৌঁছাতেই রওনা হইয়া ছিলাম।

(৭) বডিগার্ড ২/১ সিক হইতেছে।

(৮) বন্দুকগুলির মধ্যে ৫টি রাজ্যরক্ষী বাহিনীর বন্দুক। নং ৭০/৩১/৫৫/৪৩ আর বাকি লোকের ২(দুইটি)।

(৯) সেলাম - অদ্য তিনদিন জঙ্গলে থাকায়কোন মেসেজ পাওয়া যায় নাই। অমরপুর পৌঁছিলে বোধ হয় অনেক মেসেজ পাইব।

(১০) অমরপুর পৌঁছার পর মেসেজ দিব।

নগেন্দ্র

চিঠি নং- ৮

বিষয় - রতনমণির দলের লোক অমরপুর এলাকান্তর্গত কুরমা সাকিনের শ্রীতর্বং চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করিয়া তর্বং চৌধুরী ও অপর তিন ব্যক্তিকে বান্ধিয়া নিয়া গেলে কীর্তবাসী রিয়াং থানায় মোকাদ্দমা রুজো করে। থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা তদন্ত করিয়া ডাইরি দিতেছেন, সেই ডাইরির উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে দেওয়া হইল:-

২ নং সংবাদ

সময় অপ: ১-৩টা, স্থান: কুরমা, ঘটনাস্থান: স্বদেশীদলের লোকেরা তর্বং চৌধুরীর পুত্র রামানন্দ রিয়াং ও শ্রী চরন রিয়াং এর বন্দুক তালাস করিয়া ছিল। তাহারা রাজ্যরক্ষী বাহিনীর ভলাণ্টিয়ার এবং রতনমণির শিষ্য। রাত্রেই তর্বং চৌধুরীকে জরিমানা করিয়া স্বদেশী দলের লোকেরা টাকা আদায় করে। এবং ছেলের বন্দুক ২টা খামার বাড়ীতে আছে জানিয়া কতকলোক উক্ত খামার বাড়িতে যাইয়া ১ নালী কেপদার ২টি বন্দুক, কতক চাউল, তথা হইতে নিয়া আসে। তারপর তর্বং বাড়িতে একটি পালা শূকর বন্দুক দ্বারা মারিয়া পাক করিয়া মাংস খাইয়াছিল, এবং তর্বং চৌধুরীর কতক চাউল ও খামার বাড়ীর কতক চাউল পাক করিয়া ভাত বানাইয়া শূকরের মাংস দিয়া খাইয়াছে। তাহাদের খাওয়া দাওয়া হইলে পর তর্বং চৌধুরীকে তুইছরাবুহা রতনমণির নিকট নিয়া শিষ্য করিবে বলিয়া কোমরের বান্ধ খুলিয়া উদালের ছাল ঘরে ফেলিয়া যায়।

Sd I.M. Ganguli ND
(Indra Mohan Ganguli)
Nead Duruga

No 1687 Dated 20.4.53. Extract of case diary forwarded to major Kumar Shrila Shrijute Brajalal Debbarmn bahadur O/C His highness bodyguard force for fovour of information S/d N.Bhatta-charjee D/Commisioner of police Tripura state Agartala.

চিঠি নং- ৯

Massage to 2/L. Nagendra from Major B.L-no 5 Dated 18.4.53 in reply to no 3.

আপনার massage এ কতজন জখম অথবা মারা গিয়াছে কোন লেখা নাই। লুট রাজ জিনিষ d/o এর নিকট বুঝাইয়া দিবার ব্যাবস্থা করিবেন। C/O নিকট উক্ত জিনিষ গুলি তুইনানীছড়া হইতে আনাইয়া নিবার আদেশ হইয়াছে। তুইছারুবুহার মাল এবং বন্দীদের দয়পুর অথবা অমরপুর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আমার Order আছে যে প্রাণে মারিয়া ফেলিতে কিন্তু আপনার No 3 report এ বুঝা যায় আপনারা না মারিয়া আকাশে fireকরিয়াছেন। প্রাণে মারিতে হইবে। সর্বদা নিকটস্থ C/Oএর সাথে Communication রাখিবেন। তুইছারুবুহা দখল করার পর সেখানে যে ক্যাম্প আছে, সব ক্যাম্প দখল করিতে হইবে।আপনার জানা আছে যেLt Hari 2sec নিয়া বিলোনিয়ার দিক হইতে কলসী ছড়া কিম্বা লক্ষীছড়া দিয়া তুইছারুবুহা ছড়া অথবা অন্যPortionনিবার জন্য পিছন নিয়াছে। আশা করি আপনার সাথে Lt Hari রদেখা হতে পারে। বিলোনিয়ার দিক হইতে পিছনে পলায়ন করিতেছে। Amunation কম পড়ার সম্ভাবনা থাকিলে পূর্বেইReport করিবেন।

আরো কিছু Reserve amunation দয়পুর কিম্বা অমর পুরে পাঠাইতেছি। পাঠাইবার ব্যাবস্থা হইতেছে। আপনার পজিশন পরিষ্কার ভাবেmassageএ বাহির করিবেন। ১৬.৩০Hrs

চিঠি নং- ১০

Massage to L. Hari
From o/c B.G.I. originator.
No 6. Dated 18.4.53.
2nd Lt. Nagendra

তুইনানী ছড়ারcamp 16.4.53দখল করিয়াছে। তথায় অনুমান ৩০০ হইবে। তাহাদের একশত বন্দুক আছে। তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে। আশা করি Lt. Nagendra তুইছারুবুহার বড় ক্যাম্প অদ্য দখল করিতে পারে। আমি উক্ত2nd Ltকে লিখিয়াছি যে তোমারাও পিছন নিয়াছ। তোমাদের সাথে 2nd Nagendra এর দেখা হতে পারে। নগেন্দ্রর পর

আদেশ হইয়াছে যে ঐক্ত বড় ক্যাম্প দখল করার পর আরো ক্যাম্প থাকিলে দখল করিতে হইবে। তুমিd.oএর সাথে মিলাপ রাখিবে। আর যদি পার নগেন্দ্রের সাথেও মিলাপ রাখিবা।

চিঠি নং- ১১

To
Commissioner of Police
Tripura Low gang
Betaga Camp
16.4.53
সবিনয় নিবেদন

গতকল্য লক্ষীছড়া মৌজায় মার্থাহা রিয়াংচৌধুরীর বাড়িতে রতনমণির দলের প্রায় ৪০০/৫০০ লোক বন্দুক, দা , খড়্গ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পস্থিত হয়। এবং মার্থাহা চৌধুরী হইতে মং ১০০ (একশত) টাকা Extortion করিয়া লয়। তারপর লক্ষীছড়ার কান্ডলা চৌধুরীর ১টা মহিষ জোর করিয়া আনিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করে এবং শ্রী শ্রী যুতের প্রতি বিদ্রোহজনক কথা প্রচার করে। রতনমণির জয় বলিয়া জয় ধ্বনী দেয়। বেলা অনুমান সাড়ে চারটার সময় মিলিটারী ফোর্স আর্মিফোর্স সহ ঐ বাড়ীর নিকট পস্থিত হইলে দুর্বৃত্ত দল রতনমণির জয় বলিয়া চ্চস্বরে চীৎকার করে এবং মিলিটারী ও আর্ম ফোর্সকে 'আও আও' বলিয়া চেলেঞ্জ করে এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া টীলায় পর হইতে কতকগুলি বন্দুকের আওয়াজ করে। মিলিটারী এবং আর্ম ফোর্স পূর্বেই Position নিয়া ছিল এবং দুর্বৃত্ত দলের বন্দুকের রেঞ্জ-এর বাহির হইতে দুর্বৃত্ত দলের প্রতি ফায়ারিং আরম্ভ করে। দুইজন দুর্বৃত্ত গুলির আঘাতে গুরুতর রূপে জখম হইয়া পড়িয়া যায়। দুর্বৃত্ত দল তখনও ডাকিতে থাকে। তৎপর মিলিটারী ও আর্মি ফোর্স ঐ বাড়িতে ঠিয়া বেড় দিয়া তিনজন পলায়মান দুর্বৃত্ত ও জখমী দুইজন মোট ৫ জনকে ধৃত করে। একজন জখমী অনুমান সাড়ে চারঘন্টা পর মারা যায়। অপর জখমীর অবস্থাও গুরুতর। গতকল্য রাত্রেই মিলিটারী ফোর্স ধৃত তিনজন দুর্বৃত্তকে নিয়া বিলোনিয়া চলিয়া গিয়াছে। অদ্য বেতাগা কেম্প হইতে মৃত ব্যক্তি ও জীবিত জখমীকে বিলোনীয়ায় চালান দেওয়া হইতেছে। অদ্য সকালে লা গাং

হইতে লেপ্টেনেন্ট নবীন ঠাকুরের চিঠি পাইয়া আমি লক্ষীবাবু ও আর্মফোর্স সহ লা গাং ক্যাম্প-এ মিলিত হইয়াছি। জানা গিয়াছে রতনমণির দল এখনও তাহাদের বগাফা ক্যাম্পে আছে। তাহারা আরও লোক বৃদ্ধি করিতেছে। মিলিটারী ফোর্স বিলোনীয়া চলিয়া যাওয়ায় আমরা কিছু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। লেপ্টেনান্ট শ্রীযুক্ত নবীন ঠাকুর সহ আলোচনা করিয়া দুর্বৃত্ত দল যেখানেই থাকে আমরা সেইস্থানে যাইব স্থির করিয়াছি। মিলিটারী ফোর্স এই অবস্থায় আমাদের সংগে অবিলম্বে মিলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি মিলিটারী ফোর্সের এ সময় এখানে আসার অন্তরায় থাকে তবে অবিলম্বে সাতজন আর্ম কং (সদর হইতে প্রেরিত) বিলোনীয়া রহিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের নিকট প্রেরণের বাসনা। নিবেদন ইতি
১৬/৪/৫৩ ত্রিং
অনুগত
Sd/ P.K. Majumder
C.I.Belonia Lowgang

Very Urgent
No 1915 of 17.4.53 TE
Copy Forwarded to the C.O. H.H's Body guard Troops for favour of necessary orders
Sd. N. Bhattacharjee
Commissioner of Police in Charge
Tripura State, Agartala.

চিঠি নং ১২

To
D.O. Belonia (Tripura Raj) From Major B.L.
NO. 4 Dated 3.8.43 A.D.
According to H H's order herewith I am sending with my one N.C.O. and one B.G. Two boxes of reserve ammunitions containing 1000 one thousand round in each box coloured while box containing 303" is for Bodyguards and coloured green containg 410" bore for the 2nd Tripura and arm police who are none in the operation in your Division. Please handover to the fighting

troops if they require other wise you can keep in your safe custody. 16,00 hrs. place of origin sd. B.L.

চিঠি নং ১৩

To 2/Lt. Nagendra Deb
Udoypur Camp

১৮/৪/৫৩ ত্রিং তারিখের মধ্যে দয়পুরের নিকটস্থ ডাকাতদলের ছোট ছোট ঘাঁটিগুলি পরিস্কার করিয়া (ধ্বংস ক্রমে) ১৯/৪/৫৩ ত্রিং তারিখে অমরপুর রওয়ানা হইবে।

Sd. B.L. Debbarman
Commandant B.G.I.
13.40 Hours. 15.4.53 T

চিঠি নং ১৪

No 146-147 Dated 16.4.53 TE
His Highness Bodyguards Office
To
The Chief Minister Tripura State,
The Military Department T.S.F.
Sub:- Strength of troops who have moved to the state interior
According to the H H's order I am herewith informing that the under noted officers and other ranks have moved to arrest Docoits (Ratanmani Party) in T. state interior for your information and necessary action.
Sd. B.L. Bebbarman
O/C H.H. Bodyguard.
(1) To words Rodhakishor pur and Amarpur on 13/4/53 TE
(1) one S/O (2) two (3) B.G.T - 30
2nd Tripura - 19
(2) Towords Belonia on 14.4.53 -
(1) one S.O. (2) one S/O (3) B.G.T. IYS-14.

চিঠি নং-১৫

ধর্মাবতার প্রবল প্রতাপেষু

আজ্ঞাধীন দেবকাধম সেবকের কৃতাঞ্জলীপুটে বিনীত প্রার্থনা এই-

রত্নমণি সাধুর আজ্ঞায় তাহার শিষ্যগণ দ্বারা পার্বত্য অঞ্চলের প্রজাগণ প্রতি অত্যাচার সম্পর্কে শ্রীল শ্রীযুক্ত পাদপদ্মে ইতিপূর্বে রিপোর্টযোগে গোচর করিয়াছি। এতৎ সম্পর্কে স্থানীয় তদন্ত জন্য রাধাকিশোর পুর থানার নাং দাং (নায়েব দারগা) দীনেশ দাশ, ১২ জন কনেষ্ঠবল, সেবকের জেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ প্রসাদ চৌধুরী এবং আরো কতিপয় লোক সহ দক্ষিণ মহারাণী অঞ্চলে গিয়াছিল।

তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে রতনমণির শিষ্যগণ ঘেরাও করিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া বীরগঞ্জ থানা অধীন তৈছারুবুহা নামক রতনমণির ক্যাম্পের অভিমুখে নিয়ে গিয়াছে বলিয়া অদ্য এইমাত্র সাড়ে দশটার সময় লোক বাচকতায় বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। স্থানীয় থানা ও মেজিষ্ট্রেট বরাবরে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগণকে রতনমণি সাধুর নিকট বলিদান করা হইবে বলিয়াও নাকি রতনমণি সাধুর শিষ্যগণ প্রচার করিতেছে। দয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া বিভাগের বহুলোককে ধন সম্পত্তি তৈজসপত্র ও গৃহপালিত পশু সহ ধরিয়া নিয়া রতনমণি সাধুর নিকট আটক করিয়া রাখা হইতেছে ও হইয়াছে। সত্বরই অমরপুর, দয়পুর টা নে বহুলোক আসিয়া আক্রমণ করিবে বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে। ঐ সমস্ত এলাকায় যাবতীয় বল্লম, বন্দুক, খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্র ইহারা জোর পূর্বক রাজ রতনমণি সাধুর নিকট মজুত করিয়াছে। তৈছারুবুহা সাকিনে রতনমণি সাধু অবস্থান করত: একটি দূর্গ স্থাপন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বীরগঞ্জ থানা এলাকার তৈছারুবুহা হাজাছড়া পানছড়া ও দয়পুর এলাকায় তৈনানীছড়া মনছড়া চৌধুরী পাড়ায় রতনমণির ক্যাম্প প্রস্তুত হইয়া প্রতিক্যাম্পে কেম্পে ৫০০/৭০০ শত শিষ্য অস্ত্রাদি সহ অবস্থান করিতেছে। ইহারা ইহাদের সংকল্প কার্যে পরিণত অর্থাৎ দয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া এলাকার প্রজাগণকে কাটিয়া শেষ করত, লুঠত রাজ করিবে বলিয়া ইহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। এ সম্পর্কে পযুক্ত প্রতিকার করা না হইলে প্রজাগণ ও ধৃত ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষা পাওয়ার পায় নাই।

অতএব সেবকের কৃতাঞ্জলি পুটে বিনীত প্রার্থনা যে অতি সত্তর পযুক্ত

সংখ্যক সৈনিক মোতায়ণক্রমে দলভঙ্গ করত: ধৃত ব্যক্তিগণকে দ্ধার ক্রমে অত্যাচারী রতনমণি সাধু ও তাহার শিষ্য বর্গকে ধরিয়া আদর্শ দন্ডের ব্যবস্থা করত: সর্বসাধারণের সুখে শান্তিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করিয়া প্রতিপালন ও রক্ষা করার মর্জি হয়। সর্ব বিষয়ের মালিক।
ইতি সেবকাধম
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী
উদয়পুর

চিঠি নং - ১৬

Massage Form no-8 Dated 22.4.53
To 2 Lt Nagendra
From BL, O.C, B.G.T.
মহারাজ ২৪/৪/৫৩ ত্রিং তারিখে অমরপুর পৌছিবেন। ২৫/৪/৫৩ ত্রিং তারিখে ৫ নং বাহিনীর Inspection হইবে। ঐ তারিখে আপনি, হরি কর্ত্তা, জমাদার উমাকান্ত অমরপুর উপস্থিত থাকিয়া এর নিকট রিপোর্ট দিবেন।
Sd/ B.L সময় ১৫-৩০ মিনিট।

চিঠি নং - ১৭

(চিঠি নয় স্লিপ)
খালাস হওয়ার যোগ্য -
১। রাম্ব রায় - সাং আব্দুলা
২। মুর্শ্য মনি * - সাং সংগুর
৩। বস্তী বায় - সাং লাউগাং
অদ্য রাত্রেই জেলে প্রেরণ করিতে হইবে ৩ নং বস্তীবায় রিয়াং।
Sd শ্রী জীতেন্দ্র মোহন দেববর্মা
২৪/৪//৫৩ ত্রিং।

চিঠি নং -১৮

Massage Form
To
Jailor Sadar Central Jail
From Major Kumar B.L. Debbarman
H H Body Guard Troops
Dated 23.4.52 TE.

হাবিলদার শ্রী রাধা মোহন দেববর্মা মারফৎ প্রেরিত শ্রী বস্তিবায় রিয়াংকে জেল থানায় কিছু সময়ের জন্য আবদ্ধ রাখিয়া এই বস্তিবায় রিয়াং ও সূর্য্যমনি রিয়াংকে প্রেরিত হাবিলদার মারফৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত সাক্ষাতের আদেশ আমার নিকট প্রেরণ করিবেন ।

ইতি

B.L. Debbarman

23.4.53 time 13.40 hrs.

চিঠি নং - ১৯

বিষয় - রতনমণি নোয়াতিয়ার দল বিলোনীয়া এলাকায় দৈন্তাহা রিয়াং চৌধুরীর বাড়ি ডাকাতি করিলে তন্মূলে বিলোনীয়া থানায় ডাকাতি অভিযোগে ৯(৪) ৫৩ নং মোকদ্দমা স্থাপিত হয়। ঐ মোকদ্দমার তদন্তে যাইয়া তদন্তকারী যে ডাইরি দিয়াছেন সেই ডাইরির উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নে দেওয়া হইয়াছে।

বাদীর বাড়ীর নিকট।

২ নং সংবাদ। পৃ: সাড়ে দশটা, ১৯.৪.৫৩ ত্রিং দৈন্তাহার বাড়ি। প্রতিবেশী লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা গেল। ঘটনার সময় কেহ বাড়ী না থাকায় জানা গেল না দুষ্কৃতদের ভয়ে পলায়ন করিয়াছে কিনা। বাদীর পুত্র পদ্ম মোন্তম রিয়াং এর সহিত আলাপে জানা গিয়াছে যে সেও ঘটনার সময় বিলোনীয়া ছিল। ইহাদের ভয়ে বাড়ী যায় নাই, বাদীর এজাহারে লিখিত মালামাল চুরি যাওয়ার বিষয় জানাইল। এই সকল মালামাল ব্যতীত রবি রায়ের অনেক মালামাল চুরি গিয়াছে। কৃষ্ণরাম রিয়াং, জমারায় রিয়াং, বিষ্ণুরায়, শূল রায়, রাহু তহা, জীংবায়, বাহিনী, শুভাচন্দ্র ও রতন মণির ভাই এই সকল দুষ্কৃত দলের নেতা বলিয়া জানিয়াছে। তৈছার

বুহা ক্যাম্প হইতে রতন মণির দল পালাইয়াছে সংবাদ পাইয়া কালীকা প্রসাদ, গঙ্গা প্রসাদ প্রভৃতি সহ তথায় গিয়াছিল। তৈছারবুহা ক্যাম্পে একটি একনালী কেপদার বন্দুক ও রাজ্যরক্ষী ব্যাজসহ একটি পুরাতন হেট পাইয়া আনিয়াছে। বন্দুক ও হেট উপস্থিত করায় তাহা হেপাজতে নিলাম। বন্দুকটি উদয়পুর বিভাগের ৩৭৩ নং রাজ্য রক্ষীর ৮ নং ঘাটির ৪৫ নং ছেপ্ত আছে দৃষ্ট হইল।

No 2072 Dated 23/4/53 TE Sd L. Bhattacharjee S.I.
Copy forwarded to Major Kumar Shri Sujit Brajalal Debbarman
O.C H.H Body guard for favour of information
Sd. N. 23/4/53/ Bose
Commissioner of Police in charge T.S. Agartala.

চিঠি নং -২০

Letter No 2
To
B.L. Debbarman
অদ্য কলসীতে সাড়ে তিনটায় পৌঁছিলাম। ২ ডাকাত দলের পরিত্যক্ত ১ টি বন্দুক ও ডাকাতগণ পলায়ন কালে তৈরমহা, শিরা রায় রিয়াং ও বানী প্রসাদ তিনজনে দুই জন ডাকাতকে ধৃতক্রমে আর একটি বন্দুক কাড়িয়া রাখিয়াছে। সেই বন্দুক পথে প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদের অপারেশন করার পর এই তিন ব্যক্তি সাহসের সহিত দুইজন পলায়মান ডাকাতকে ধরিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছে। তৈরম হার উপর ডাকাতরা গুলি করিয়াছিল। আগামীকাল ডুম্বুরের দিকে অগ্রসর হইতেছি। কলসীতে ১টি ডাকাত ধৃত করা হইয়াছে।

Sd. H.K. Debbarman
19.4.53 রাত্রি ১০টা

চিঠি নং - ২১

Letter No 3.
To
B.L. Debbarman
ডাকাত দলের পরিত্যক্ত একটি ক্যাপদার বন্দুক (তৈছরু বুহা প্রাপ্ত) কলসী

ক্যাম্পে দাখিল করিয়াছে। বন্দুকের নম্বর 8 RRR No.22. অদ্য কলসী বাড়ীতে বেলা ৩ টায় পৌছিয়াছি। এদিকে ডাকাত দলের লোক দলবদ্ধ ভাবে একত্রিত থাকার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অত্র ক্যাম্প হইতে আসামী দিগকে সদর কোর্টে প্রেরণ করা যাইতেছে। আগামীকল্য পর্যন্ত কলসী ক্যাম্পে থাকিয়া অনুসন্ধানে ব্যপৃত থাকিব। বি জি টির একজন ও সেকেন্ড ত্রিপুরার ছয়জন সিপাহি সদর হেড কোয়াটারে রিটার্ন করা যাইতেছে। তাহারা কিছু অসুস্থ এবং কুইক মার্চিং প্রতিবন্ধক। সকল ভাল।
Sd H K Debbarman
23/4/53

চিঠি নং - ২২

Letter No 4
To
B.L. Debbarman
আমরা অদ্য পর্য্যন্ত রাই বাড়ীতে আছি। এখানকার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমাদের আগরতলাতে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। কারণ এখানকার কেহই কোন কথা বলিতে চায় না। এমন কি তাহাদের বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত দেখাইতে চায় না। এখানকার সমস্ত চৌধুরীরা পর্য্যন্ত এসব করিতেছে। এমন কি গোপনে গোপনে লোক পাঠাইয়া প্রায় সমস্ত স্বদেশীদের সাবধান করিয়া দিতেছে। কাজেই প্রায় সবখানেই বর্ত্তমানে আমরা কে দোষী আর কে নির্দোষ বুঝিতে পারিতেছি না। কিম্বা ধরিতে পারিতেছি যে সরিষার দ্বারা ভূত তাড়াইব এখন সেই সরিষাতেই ভূতে ধরিয়াছে। চৌধুরীরা তাহাদের নিজেদের লোক দোষী হইলেও বলিতে চায় না। নির্দোষকে, তাহাদের সংগে বিরোধ থাকিলে, দোষী সাজাইয়া আমাদের দেখায়, কাজেই এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য অতিসত্ত্বর আদেশ পাওয়া প্রয়োজন। ইতি - ২১/৪/৫৩ ত্রিং সময় রাত দশটা।
H.K. Debbarman

চিঠি নং - ২৩

To B.L. Debbarman
আমরা অদ্য কলসী হইতে বেলা ১০টায় রওয়ানা হইয়া ১ লক্ষীছড়া পৌছিয়াছি। আপনার ১৮ তারিখের ম্যাসেজ ও তৎসহ একটি আদেশ ২২শে পাইয়াছি। নবীন ঠাকুর ও ধীরেন জমাদারের জ্বর হইয়াছে। সিপাহিদের মধ্যেও ২/৩ জনের জ্বর হইয়াছে। আমিও পেটের অসুখে ভুগিতেছি। কলসীতে থাকাকালিন টাকা দিয়ে আমরা চাউল, ডাল ইত্যাদি পাইনাই। এখানে এবার ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। কাজেই বাধ্য হয়ে লক্ষীছড়া নামিয়া আসিতে হইল। ইতি ২৩/৪/৫৩ ত্রিং সময় বিকাল ৪টা
Sd. H K Debbarman
2nd Lt

চিঠি নং- ২৪

আর একটি চিঠি যোগেন্দ্র দেববর্মণ মহাশয় লিখিত -
রাধা কিশোরপুর ক্যাম্প ১৪/৪/৫৩ ত্রিং নায়েব দারোগা দীনেশ বাবুকে সমস্ত বিষয় গোচর করার জন্য পাঠান হইল। দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় আছি। Mobile Platoon O.K. গতকল্য রাত্রে ১,০০ পৌছিলাম। D.O. মহাশয়, কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিজয় প্রসাদকে এবং তাহাদের পরিবারকে রাধা কিশোরপুর টাউন হইতে আগরতলায় পাঠাইয়া দিতেছি। যাহাতে তাহাদের জন্য টাউন কোন রূপ বিপন্ন না হয়।-
নগেন্দ্র চিঠি ১৫/৪/৫৩ ত্রিং (নগেন্দ্র বাবুর)
এইমাত্র জানিতে পারিলাম রতনমণি দস্যুর স্ত্রী কতকগুলি খাসিয়া ও কতকগুলি রিয়াং নিয়া তুইছারুবুহা ক্যাম্পে পৌছিয়াছে। অনুমান হয় কৈলাসহর এলাকা হইতে আসিয়াছে।
(পৃথক একটি চিঠির অংশ বলে মনে হয়)

চিঠি নং - ২৫

ক্যাম্প- তুইছারুবুহা, তারিখ - ১৮/৪/৫৩ ত্রিং

' পাদপদ্মের অসীম কৃপানুগ্রহে তুইছারুবুহা আসি দেখি দস্যুদল সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। এমন কি কোন ঘরে একটি জিনিষও রাখিয়া যায় নাই। এখানে ১৬.০০ বাজে পৌঁছিয়াছি। গতকল্য যখন নিকটবর্ত্তী গ্রামে তখনই শুনিতে পাই যে তৈনানী ক্যাম্পে যখন আমরা হানা দেই তখন অনেক লোক ঐখান হইতে পলাইয়া রাত্রিতে খবর দেয় সৈন্য আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ক্যাম্পের লোক (তৈছারবুহা) চতুর্দিকে পলাইতে থাকে। রতনমণি দস্যু ও রাত্রিতেই ছোট একটি দল নিয়া চলিয়া যায়। অনুমান হইতেছে দস্যু সর্দার ব্রিটিশ এলাকায় চলিয়া গিয়াছে।

(পত্র দাতার নাম উল্লেখ নাই / পত্রদাতা Lt Nagendra)

চিঠি নং - ২৬

ক্যাম্প - ডুম্বুর নগর, নতুন বাজার, ১৯/৪/৫৩ ত্রিং

গতকল্য তৈছারবুহা হইতে ৯-৩০ রাত্রে রওয়ানা হইয়া রাস্তায় অনেক দস্যুদের বাড়ী চেক করিয়া কাহাকেও না পাওয়াতে - এমন কি ঘরে একটিও জিনিষ পত্রাদি নাই এইরূপ দুই তিনটি পাড়ায় আগুন দেওয়া হইয়াছে। তারপর রামচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী। তখন সে বলে যে গতকল্য বিকাল বেলা খুসীকৃষ্ণ ও সংগে দুটি লোক ডুম্বুরের দিকে যাইতেছে। তাহাদের নিকট একটি বন্দুক, বড় খড়্গ ও একটি দা আছে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার রওয়ানা হইয়া পড়ি। আর একটি 'অসুই ত্রিপুরা' পাড়াতে বিশ্রাম করি। পাড়াটির নাম 'ইসরি পাড়া'। ইছারি ছেড়ার নামে পাড়াটির নাম ইসারি পাড়া। এখানে তাহাদের নিকট শুনিলাম আসিবার পথে (আমরা) অন্য আর এক রাস্তায় দুইটি পাড়া আছে। তাহারা সব দস্যু দলের লোক। আবার সেখান হইতে ফিরিয়া ঐ পাড়াগুলির দিকে রওয়ানা হই। সেখানে পৌছি। পাড়াতে বেশীর ভাগ লোক নাই। বলে জুমে চলিয়া গিয়াছে। আমরা যখন যাই তখন পালাইতে চেষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু পলাইতে পারে নাই। আমরাও ত্রিপুরী ভাষায় পালাইও না ডাক দেওয়ায় পালায় নাই। বহু কষ্টে রাত্র তিনটায় তীর্থমুখ খুসীকৃষ্ণের বাড়ীতে প্রবেশ করি। কিন্তু সে নাই। তন্ন তন্ন করিয়া দেখা হয় কিন্তু কিছু পাই নাই। মেয়েদের বাহির করিয়া বলি তোমরা তোমাদের জিনিষ বাহির কর। ঘরে

আগুন দিয়া দেই।
দস্যু সর্দার রামগড় অভিমুখে রওয়ানা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। খুসীকৃষ্ণ লুসাই অভিমুখে রাম বাহাদুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে শুনা যায়। লুসাই কুকীর সাহায্যে চলিয়াছে। গতকল্য তৈছারবুহা হইতে তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলেকে আগরতলায় পাঠাইয়াছি। আশা করি পৌঁছিয়াছে।

চিঠি নং - ২৭

ক্যাম্প - বিক্রমপুর, তারিখ- ২১/৪/৫৩ ত্রিং
ডম্বুর নগর হইতে আসার রাস্তায় শুনিতে পারিলাম হাজাছড়া দস্যুদলের যুবরাজ লক্ষ্মীচরণ রিয়াং-এর ছেলে আবার একটি দল গঠন করিতেছে। লোক অনুমান ১০০/১৫০ হইবে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র রমেশ জমাদার ও ভারত জমাদার এবং সংগে ১৫ জন B.G. সহ পাঠাইয়াছি। ডম্বুর নগর থাকাকালীন মণি রিয়াং এর ভাই দাবারায় একটি দল গঠন করার চেষ্টা করিয়াছিল। আমাদের আসার সংবাদ পাইয়া পাড়া ছাড়িয়া যায়। আমরা পাড়া জ্বালাইয়া দিয়া আসি। হুজুর বাহাদুরের প্রেরিত ৫ নং মেসেজে লিখা হইয়াছে, কতলোক মারা গিয়াছে, কিন্তু আমরা ধরিবার চেষ্টাই বেশী করিয়াছি। তৈনানী হইতে ডম্বুর বাজার পর্য্যন্ত অনুমান ৩৫ মাইল কোন রিয়াং বাড়িতে নাই, সব বাড়ী খালি।
আমরা যখন দখল করি ও প্রত্যেক ঘর তালাস করি তখন কেবল সুতা, কাপড়, থাল ঘটি বাটি ছিল। কোন ধান চাউল ছিল না। তবে পাড়ার নিকট জঙ্গলে অনুমান ৩০০ শত গরু ও ১০০শত মহিষ, শূকর অনুমান ৫০ এর উপর ছিল। ছাগল ও শতেক ছিল। মুরগও প্রচুর পরিমানে ছিল। ঘরগুলিতে আগুন দিয়া চলিয়া আসি। সূতা, কাপড়গুলি জ্বলিয়া গিয়াছে। গরু, মহিষ, শুকর কেবা কাহারা নিয়া গিয়াছে। তুইছারুবুহা ক্যাম্পে অনুমান ১০০০ লোক ছিল।
বিক্রমপুর, তারিখ- ২৭/৪/৫৩ ত্রিং
উদয়পুর, অমরপুর এলাকায় দস্যুদলের আর কোন দল নাই। তাহাদের বড়ই অভাব। এমনকি লবন ছাড়াও শুধু ভাত খাইতেছে। যেই দলটি শেষ ধরিলাম তাহারা ২/৩ দিন পর একমুঠ ভাত পায়। এও লবন পর্য্যন্ত নাই; শুধু ভাত ও সিদ্ধ করুল। মেয়েদের যখন ছাড়িয়াছি তখন কাঁদিয়া বলে আমাদের ঘরবাড়ীও নাই, খাওয়ারও নাই। কোথায় যাইব, আমাদের

উপায় কি? (এটি একটি পৃথক চিঠি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, যদিও প্রেরক ও প্রাপক বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই)

চিঠি নং - ২৮

ক্যাম্প - উদয়পুর, তারিখ - ১৪/৪/৫৩ ত্রিং, সময়- ১-৩০ পি.এম.
কুমার বি.এল. দেববর্মণের নিকট লেখা -

Sir,

এইমাত্র দীনেশ বাবু দারোগা ও দুটি পুলিশ মুক্তি পাইয়া উদয়পুর হেড কোয়ার্টারে সকালবেলা ১০ টায় পৌছিয়াছে। সম্যক অবস্থা জানাইবার জন্য উক্ত দীনেশ বাবুকে সদরে প্রেরণ করা যাইতেছে। উদয়পুর পৌছিয়া অবস্থা দেখা গেলা টাউনের লোক Panicky হইয়া উঠিয়াছে। দীনেশ বাবুর বাচকতায় রতনমণির Organisation কিরূপ হইয়াছে জানা যায়। রতনমণির নিকট যাইতে ৭টি গেইট পার হইতে হয় এবং তাহারা এমনভাবে ৫টি ঘাটি প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহারা Spying Systcm এমন করিয়াছে যাহাতে তাহাদের পেছনে ভাল মাল Brain man আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা ২০০০ লোকের সংগে যে কোন সময় Rasistance দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাহাদের Organisation বৃটিশ ও স্বাধীনের রিয়াং এবং নোয়াতিয়া আছে। লোক সংখ্যা ১২০০ রিয়াং এবং নোয়াতিয়া ৭০০০। তাহাদের রাজত্বের নমুনা স্বরূপ মন্ত্রী পরিষদ ও সৈনিক সৃষ্টি করিয়াছে।

আপনার একান্ত অনুগত
জে.এস. দেববর্মণ, এ.টি
১৪/৪/৫৩ ত্রিং।

খুসীকৃষ্ণের গান ও বিদ্রোহে তার প্রভাব

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিবাসী রতনমণি নোয়াতিয়া ছিলেন বিবাহিত সাধু। ১৯৩২ ইং সনে অমরপুর ডম্বুর অঞ্চলের অধিবাসী খুসীকৃষ্ণ নোয়াতিয়া সর্ব প্রথম তাহার শিষ্য হন। তাহার এবং কিছু রিয়াং শিষ্যের প্রচেষ্টায় রতনমণি ধীরে ধীরে অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনিয়ায় ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার এবং শিষ্য গ্রহণ করা আরম্ভ করেন। খুসীকৃষ্ণ ছিলেন মূলত: কবি গায়ক এবং ধার্মিক ব্যক্তি। তাহার রচিত ধর্ম মূলক গানগুলি প্রার্থনা সভায় গীত হত। পাহাড়ি লোকসংগীতের সুরে লয়ে তালে খুসীকৃষ্ণের রচিত গানগুলির অবদান ছিল মর্মস্পর্শী। এই গানগুলি গীত হওয়ারপর রতনমণি গানের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ বা আলোচনার মধ্যে রিয়াংদের স্থানীয় সামাজিক সমস্যাও স্বভাবতই: এসে যেত। এই গানের এবং সুরের হৃদয়গ্রাহী প্রভাব অনুভব করার সুযোগ লেখকের ঘটেছিল ১৯৪৬-৪৭ ইং সনের পৌষ মাসে ডুম্বুর তীর্থের মেলায়।

১৯৪৩ সনের বিদ্রোহের পর ঐ সময়েই (১৯৪৬-৪৭ইং) প্রথম রতনমণির প্রথম সারির শিষ্যগণ সংঘবদ্ধ ভাবে ডুম্বুর তীর্থে সমবেত হয়েছিল। পৌষ সংক্রান্তি দিন সন্ধ্যা বেলা থেকেই গান গাওয়া শুরু হয়। সারা রাত একতারা ও খঞ্জনী বাজিয়ে নৃত্য সহ বহু গান গীত হয়েছিল। ডুম্বুরের সেই অন্ধকার নির্জন পরিবেশ, জল প্রপাতের একটানা সুরের গর্জন, তার সংগে সুর তাল লয়ে নৃত্য সহ আদিবাসী ভাষায় গাওয়া গানগুলি লেখকের মত বেরসিকের মনেও মোহময় আবেশ এবং এক অজানা অনাস্বাদিত অনুভূতির সঞ্চার করেছিল।

একটি গান গীত হওয়ার সময় গানটি এমনভাবে জমে উঠল এবং সকলে

এমনভাবে অংশ গ্রহণ করে আনন্দ প্রকাশ করতে শুরু করল যে লেখক আর চুপ করে থাকতে না পেরে পাশে বসা ভূতপূর্ব সেনাপতি রামপ্রসাদ রিয়াং এর নিকট গানের অর্থ জানতে চাইল। তিনি লেখককে গান গাওয়ার সংগে সংগেই বাংলা করে বুঝিয়ে দিলেন - তুমি হরিনাম না'ওনা, তোমার হৃদয় শূণ্য, হাতে ঘড়ি বেঁধেছ, পায়ে জুতা পরেছ, মাথায় সুগন্ধী তেল মেখে কী আনন্দ পেলে ? হাতি ঘোড়া চড়ে আর সুন্দর হতে চেয়োনা, হরিনাম নাও ইত্যাদি। এমন একটি অপূর্ব হৃদয়গ্রাহী ধর্ম সংগীত ইতি পূর্বে লেখক ধৈর্য্য ধরে শুনে নি। এই গানটি সকল সাংসারিক চিন্তাশীল ধার্মিক ব্যক্তির মনের কথা। খুসীকৃষ্ণ তা অপূর্ব সুরে এবং গানের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু লেখকের বিস্ময় সেখানেই শেষ হল না। রামপ্রসাদ তারপর ব্যাখ্যা করে বললেন, এই গানটির যেমন ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে তেমন অন্যান্য অর্থও আছে। এই গানটি প্রকৃতপক্ষে খগেন চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে লেখা। এমন আরও অনেক গান আছে যার এমন দু'টি অর্থ আছে। গুরুদেব সেই গানগুলি গাওয়ার পর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। সংগে সংগে এই গানটির আরও যে অর্থ হয় তাহা লেখকের নিকটও স্পস্ট হয়ে উঠল।

খগেনবাবু লেখাপড়া জানা অবস্থাপন্ন রিয়াং সর্দ্দার চৌধুরী, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দেহী স্বাস্থ্যবান সুশ্রী যুবক। রাজ দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তি হতে শুরু করেছে। ঐ সময়ে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে যেসব হাতি ধরার খেদা তৈরী হত, তার সংগে খগেন বাবুর যোগাযোগ বিচিত্র নয়। অংশীদার হিসাবে না হলেও ঠিকাদার হিসাবে তাহার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, হাতি ধরার খেদাতে হাতি ডাকিয়ে আনতে বহু লোকের (শ্রমিকের) প্রয়োজন হয়। খগেন বাবুর মারফত এইসব লোক সংগ্রহ করা হত। এইসব নানা কারণে পোষা হাতি চড়ে তিনি সেকালে ঘোরাফেরা করতেন। পরবর্ত্তী 'রায় কাঞ্চন' (রিয়াংগণ রায়ের সংগে 'কাঞ্চন' শব্দটি যোগ করত।রিয়াং ভাষায় সর্দারকে কাচাক বা কাজকও বলে। কাজকও থেকে কাঞ্চন শব্দের উৎপত্তি) হওয়ার জন্য সম্ভবত: তিনি সেই কাল থেকেই বিশেষ চেষ্টা করে চলে ছিলেন।

ঘড়ি বাঁধা হাত, হরিনাম হীন শূণ্য হৃদয়ের ইঙ্গিত যুক্ত রতনমণির গানের ব্যঙ্গ শিক্ষিত খগেন চৌধুরী গায়ে মাখবেন না তা ভাবাই যায় না। খগেন বাবুও উত্তর দিয়ে ছিলেন তবে গান বেঁধে নয়, ক্ষমতাবান দাম্ভিক শাসক যেভাবে উত্তর দেয় সেইভাবেই উত্তর দিয়ে ছিলেন।

লেখকের প্রশ্নের উত্তরে রামপ্রসাদ বললেন খুসীকৃষ্ণ এই গানগুলি আগরতলার প্রেস হতে ছাপিয়ে বিলি করেছিল। পরে লেখককে আগ্রহে একখানা গানের বই তিনি দেখতে দিলেন।

১৯৭৪ সনে রতন মণির এবং রিয়াং বিদ্রোহের বিষয়ে লেখার সিদ্ধান্ত লেখক নেন। তখন এই বইটির বিশেষভাবে সন্ধান আরম্ভ করে। অনেক চেষ্টার পর ১৯৭৬ ইং সনে বইটি সংগ্রহ করা হয়। বইখানি কাঞ্চনপুর (ধর্মনগর) এর মাছমারার শ্রী ভারতী নন্দন রিয়াং চৌধুরী লেখককে সংগ্রহ করে দেন। লেখকের অনুরোধে গানগুলির বাংলা তর্জমা করে দেন আগরতলার শ্রীনরেশ চন্দ্র দেববর্মা। নরেশ বাবু বলেছেন তিনি আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ করেছেন। তাদের উভয়ই লেখকের ধন্যবাদের পাত্র। নরেশ চন্দ্র দেববর্মার বাংলা তর্জমা কিছুটা পরিমান সংশোধন ও পরিবর্দ্ধিত করায় শ্রী পঞ্চরায় রিয়াং, শ্রী শচীন্দ্র ত্রিপুরাকে ধন্যবাদ জানাই।

বইখানির নাম 'ত্রিপুরা রাচামুংখাকচাং খুম্বার বাই'। প্রেসের নাম বি,এল, প্রেস (আগরতলা) সন ১৩৪৬ ত্রিং (১৯৩৬ ইং) ১৪ই আশ্বিন। এই বইখানায় মোট ৩৩ টা গান আছে। এছাড়াও রতনমণির শিষ্যদের গুরু বন্দনার গান আছে। যা এই বহিতে ছাপান হয় নি। কাঁঠালিয়ার শিষ্যদের নিকট প্রাপ্ত গুরু বন্দনার গানটি 'রতনমণি ও রিয়াং বিদ্রোহ'-তে ছাপান হয়েছে। ছাপা হয়নি এমন আরও অনেক রতনমণির শিষ্যদের গাওয়া গান নাকি ছিল। সেগুলি খুসীকৃষ্ণই নাকি রচনা করেছিলেন।

খুসীকৃষ্ণ সুগায়ক ও কবি ছিলেন গুরুর উপদেশ নিয়ে তিনিই গানগুলি রচনা করেছিলেন। বাংলার মধ্যযুগের কবিগণ যেমন গানের শেষে নিজের নাম প্রকাশ করতো ঠিক সেইভাবে গুরুভক্ত খুসীকৃষ্ণ প্রতিটি গানের শেষে নিজের বা গুরুর নাম প্রকাশ করেছেন। রতনমণির শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গুরু হিসাবে মাহাত্ম্য প্রচারে খুসীকৃষ্ণের মাধুর্য্যপূর্ণ সংগীতগুলি বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল।

রতনমনি অন্তত: একটি অতিমহৎ কাজ করেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা সংগীত গাওয়া ও উপদেশ দেওয়ার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় মদ খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে রিয়াংদের দারিদ্র কমে যাওয়ার সাহায্য করেছিল। মদ তৈরী করতে গিয়ে চাউলের অপচয় হয়নি। যদিও তারা গাজা সেবন করত। পার্বত্য অঞ্চলে মদের সংগেও প্রচুর ধুমপান চলে। রতনমণি মদ বন্ধের উপদেশ দিয়ে গাজাব প্রচলন করেন। এই গাজা বাজার থেকে কেনা

গাজা নয়। কবিরাজি ভাষায় যাহাকে ভাং বলে সেই ভাং গাজা। পাহাড়ে তৎকালে অযত্নে প্রচুর চাষ হত। লেখক অধিকাংশ রতনমণির শিষ্যের বাড়ির আশেপাশে সেকালে এই ভাং গাছের চাষ দেখেছে। এদিয়ে তারা কোন ব্যবসা করতেন না। নিজেদের পারিবারিক প্রয়োজনেই ব্যবহার করতেন।

১৯৪৬ইং সনে ডুম্বুর তীর্থমুখে বা তীর্থে শোনা ঐ গান খানি আছে গানের বহির ১৩নং গানে। বাংলা অনুবাদে প্রথম লাইনটি শুরু হয়েছে এই ভাবে একবার তুমি এর ফল ভোগ করবেই/হরিনাম একবারও নাওনা, তোমার হৃদয় শূন্য/পায়ে জুতা পরেছ/হাতে ঘড়ি বেধেছ/মাথায় সুগন্ধ মেখে/কি আনন্দ পেলে? ইত্যাদি। ভাগবত ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখলে এই তুমি হচ্ছ জীবের মন। মনকে এভাবে সজাগ করার একাধিক গান বাংলা সাহিত্যে আছে। প্রকাশ্যে নির্দোষ আধ্যাত্মিক সংগীত। কিন্তু যখন গুরুদেব চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলেন দেখ, অমুকের সাথে এর মিল আছে, তখন সুরে ও তালে গানের প্রভাব আরো বিশেষ ভাবে শিষ্যদের হৃদয় স্পর্শ করে। খগেন চৌধুরী যে একবার এর ফলভোগ করবেই, সে বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত হয়।

এমন ভাষার ও সুরের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা একাধিক ব্যাখ্যা ও ভাবযুক্ত আরো গান রতনমনির শিষ্য মহলে জমে ছিল। ৬নং গান খানিও বোধ হয় তাই। সেই সব সঙ্গীতের প্রহারে জর্জরিত হয়ে খগেন চৌধুরী বোধ হয় ক্ষিপ্ত হয়ে শিষ্যদের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছিলেন সামাজিক বিচারের মাধ্যমে।

ভাব ঐশ্বর্য্য রতনমনির বন্দনা গানটিও অপূর্ব ভক্তির নিদর্শন। সব হিন্দু ভক্ত গুরুকে ভগবত দৃষ্টিতে দেখেন। হিন্দু শিষ্যগন গুরুকে ব্রহ্মাবিষ্ণুর প্রতিভূ রূপে পূজা করেন। রিয়াং ভক্তগনও রতনমনিকে সেইভাবে পূজা করেছিলেন। সেই অর্থে নির্দোষ গুরু বন্দনা। কিন্তু খগেন চৌধুরীর কান দিয়ে গানটি শুনলে এর ভাবার্থ অন্যরূপ দাঁড়াবে। প্রার্থনা গানের ভাষায় রতনমনি কে? রতনমনি জগতের গুরু। তিনি মানুষের আইন মানেন না। যে মানুষের আইন মানে না সে রাজার আইন ও মানেনা। কি সাংঘাতিক প্রচার। তিনিই রিয়াংদের মা বাবা এবং ভগবান। সমাজের জয় এবং বিজয় তাহার ইচ্ছাতে নিরূপিত হয়। তিনিই বংশের অর্থাৎ রিয়াং সমাজের উদ্ধার করেন। রতনমনি রিয়াংদের হৃদয়ের রাজা, ভগবান। এমন বন্দনা গান ও প্রচার শুনার পর উচ্চাকাংখী খগেন চৌধুরীর পক্ষে চুপচাপ বসে

থাকা সম্ভব নয়। শিষ্যগন একদিকে নানা ভাবে গান বেঁধে খগেন চৌধুরীকে ব্যাঙ্গ করছে। অন্যদিকে তারা রতনমনিকে ঈশ্বরানের আসনে বসিয়ে দলের জয় লাভের আশা করছে। সংঘাত যে বাঁধবে তা ছিল অবধারিত।

খুসী কৃষ্ণের এই গান গুলি একদিকে যেমন রতনমনির ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ রেখাটি ফুটিয়ে তুলেছে অন্যদিকে ত্রিপুরী ভাষায় মাধুর্য্যপূর্ন ধর্মীয় সংগীতের নিদর্শন হয়ে আছে। রতনমণির আন্দোলনের সাথে রিয়াং সমাজের উত্থান ও পতনের ইতিহাস যেমন জড়িয়ে আছে ঠিক সেই ভাবে এই গান গুলির মধ্যেও রিয়াংদের ধর্মীয় চিন্তা ও অগ্রগতির ইতিহাস লুকিয়ে আছে। বাংলা তর্জমা থেকেও খুসীকৃষ্ণের রচিত গানের ভক্তি রস ও মাধুর্য্য অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গুরুর কৃপায় তিনি হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্বকে অতি সহজ ও সরল ত্রিপুরী ভাষায় প্রকাশ করেছেন, অথবা বলা যায় তাহার কাব্য প্রতিভা ধর্মকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পেয়েছে। তাহার ভগবৎ চরণে নিজকে নিবেদন করার গভীর আকাংখা এবং নিজের দৈন্য ও অক্ষমতা অপনোদনের জন্য কাতর প্রার্থনা গানের শেষে যুক্ত হয়ে গানগুলিকে ভক্তি ও ধর্মরসের মধুভান্ডে পূর্ণ করেছে। অন্যদিকে এই গানগুলি সুরে, তালে, লয়ে সমবেতভাবে গীত হয়ে রতনমণির শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। রতনমণির গান নির্ভর ব্যাখ্যার প্রভাবে রিয়াংগণ সংগঠিত হয়েছিল এবং গুরুকে অসীম ভগবৎ ক্ষমতার অধিকারী কল্পনা করে রিয়াং সমাজকে পূনর্গঠন করার সংকল্প রিয়াং শিষ্যগণ গ্রহণ করেছিল। গুরুর সাহায্যে অসাধ্য সাধন তারা করতে পারবে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল। ত্রিপুরী নোয়াতিয়া সমাজের রতনমনির প্রভাবের ফলে রিয়াং সমাজে ত্রিপুরী ভাষারও প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছিল।

গান গুলি যাতে একেবারেই অবলুপ্ত না হয়ে যায় তার জন্যই পূন: প্রকাশের চেষ্টা। ৩০ এর দশকে ধর্মীয় সংগীত রচনা করে ছাপিয়ে প্রকাশ করার উদ্যোগ সর্বপ্রথম খুসীকৃষ্ণ নোয়াতিয়াই নিয়েছিলেন। এই গান গুলি ত্রিপুরী ভাষার সাহিত্য কীর্ত্তির বিরল নিদর্শন। ত্রিপুরী ভাষায় রচিত খুসীকৃষের গান গুলির নব মূল্যায়ন হবে এবং রিয়াং বিদ্রোহের ইতিহাসে আলোকপাত করবে এই আশা নিয়ে গান গুলি পূন: প্রকাশ করা হল। বঙ্গানুবাদও সংগে দেওয়া হল।

ত্রিপুরা রাচামুং খাকচাং খুম্বার বাই

রচয়িতা - খুসীকৃষ্ণ নোয়াতিয়া

১. খুলুমকা ত্রিন্না বলি মা,
কৃষ্ণ ঈশ্বর নি বাগয়।
বিশ্বাস ভক্তি মুংছা সিয়া,
তাম উপায় মা।
আং বুঝিয়া থার মালিয়া,
সাগৈ রদি মা।
ই সময় নুং সে যত
ক্ষেমা রদি মা।
কৃষ্ণ ঈশ্বর নাম ফাইলাংকা,
কলি চেন্নাই অংখা,
স্বয়ং লক্ষ্মী মাই চার নাই,
আমা মাইঞ্জুক মা।
গুরু রত্ন সাগৈ রখা,
সারুই ফুরুং সাতরাই দুমখ্যা।
হানি কেচেন খুসী কৃষ্ণ,
ক্ষেমা রদি মা।

১. নমি ত্রিনাথেরে মাগো,
কৃষ্ণ ঈশ্বরের তরে।
বিশ্বাস-ভক্তি কিছুই নাহি জানি
কি উপায় মাগো,
আমি বুঝি না, ঠাহর পেলাম না
বলে দাও তুমি মা।
এই সময় তুমিই যত ভরসা
ক্ষমা করো মা।
কৃষ্ণ ঈশ্বরের নামের বান এসেছে,
কলি কালের শেষ হবে।
স্বয়ং লক্ষ্মী অন্নদাত্রী,
ধনের দেবী তুমি মা।
গুরু রত্ন বলে দিয়েছেন,
সকাল সন্ধ্যায় ধূপ ধুনা দিয়েছি,
জগতের অধম খুসী কৃষ্ণ
ক্ষমা করো মা।

২.সাল কুরুইখা সন্ধ্যা অংখা,
ফাইদি আমারক,
ডাকতি ফাইদি নক।
ইয়াগ, কংনুই-ন জোর খালাই-খা,
বাসাক-ন লকলৈ রোখা,
আর তামা নাইজা নক।
নাইতুই নাইতুই নুরক লুইয়া,
হরতুই কুচং আখাইব তুং-ইয়া,
হরনি হরণ তুইনি তুইন বাগ
তং ফাই দক।
হর তিলাঙ্গৈ সাল রফাইদি,
বাখানি মতে নুং-জাগই তংদি।
এমাং চাখা খুসী কৃষ্ণ,
উদুঙ্গ লাদি দক।
গুরু রত্ন কত সাকা:
গেলাম (জ্ঞান) কুড়ুই তংবাই লাংখা,

জানি রাখা-ন জান থিক খাইদি,
বলাই থানাই-রক।

২. বেলা গেল সন্ধ্যা হলো,
এসো মা সকল
শীঘ্র এসো ঘরে।
দু'হাত জোর করেছি,
দেহকে গড়িয়ে দিয়েছি,
তোমরা আর কি চাও?
খুঁজে খুঁজে ও দেখা পেলাম
না,
আগুনের মত উজ্জ্বল তবু,
আগুনের তাপ নেই।
আগুন হলে আগুনের মত,
জল হলে জলের মত
এসে দেখা দাও।
রাত্রি নিয়ে দিন দিয়ে যাও,
মনের মত করে আমায়
ডাকতে দাও।
স্বপ্নাবিষ্ট হয়েছে খুসী কৃষ্ণ,
ওপারে আমায় নিয়ে যাও।
গুরু রত্ন কতবার বলেছেন-
অনাচার জীবন যাপন করছো,
যার যার মনকে ঠিক করো,
তোরা সব যে অবুঝ।

৩. গঙ্গা গয়া থানানি নাং-ইয়া,
সাগ তঙ্গ তিত্তলায়।
নবার বাই থাংনাই -
নবার বাই ফাইনাই -
নবার বাই তংনাই বাসাক লাই।
প্রাণসে চানাই প্রাণসে নুংনাই,
প্রাণ তামাব সাগ'নাই ভাই।
খাসিলিয়া খুসী কৃষ্ণ
প্রাণনি বাগৈ হায় হায়।

৩. গঙ্গা গয়ায় যেতে হয় না,
দেহেই আছে সব তীর্থ।
বাতাসে যাবে, বাতাসে আসবে,
বাতাসেই বাঁচে এই দেহ।
প্রাণই খাবে, প্রাণই পান করবে,
প্রাণ দেহের কাছে আর কি চায়?
অজ্ঞান খুসী কৃষ্ণ,
প্রাণের জন্য হায় হায় করছে।
গুরু রত্ন বাণী দিয়েছেন,

গুরু রত্ন উক্তি রখা
বাখা কিসা মতি অংখা।
যে হিনজাকনাই হিনজাগয় তংখা,
প্রাণ তামাব থার মাইয়া বায়।

চিত্তের কিছু মতি হয়েছে।
যাকে মন্দ বলা হচ্ছে তাকে শুধু মন্দই
বলা হচ্ছে,
প্রাণ কি তা, না জানার কারণে।

৪. খালাইলি নুং তমই মাঞ্জুক লাং।
মাইয়ানী বাগৈ -দয়ান সিয়া,
দয়া তামাব বকতই ফাইলাং।
মাইয়া বাই খাজাগৈ দয়া-ন থার মাইয়া,
খিলাম নাইসন্দি তালুক-ব লাং লাং।
অবাই কুস্ মবাই পূরক মবাই রেচক,
বাসাক-ন থুং লাং।
ইয়াথুই-অ ন ফুর কপাল চুড়াই
ইয়াগ তামা তং, সুমুরনুখুন লাং।
আই চুকনি সময় সীয়ারী ফুদু-দুই,
কুলক মাইয়া বাই সাল চুক -জাকলাং।
কপালাই হামলিয়া খুসী কৃষ্ণ
বাসাক বিসিংইয় তামা নুকসনলাং।
রত্ন মণি - ণ মণি তা হিন্দি -
থার মাইয়া কগ্ন সাগৈ থাংপাইলাং।

৪. মনরে, বলো তুমি কি পেলে?
মায়ার বাঁধনে দয়াকে জানলে না,
দয়া কি, কোথা থেকে এলো।
মায়ার বন্ধনে পড়ে দয়ার হদিশ
পেলেনা,
গুহ্যের দিকে উঁকি দাও তালুও পরিস্কার
খোলা।
এর দ্বারা জড়ো, এর দ্বারাই পুরণ,
ভাঙ্গন,
দেহ নিয়ে এ কি খেলা?
রক্তেই আছে অদৃষ্টের শ্বেত মুকুট,
হাতে আছে কি, শুধু আছে সংসারের
বাঁশী।
উষা কালে মন অজ্ঞানতার কুয়াশায়
ঢাকা থাকে,
হেলায় যে দিন বয়ে গেল।
খুসী কৃষ্ণের কপাল মন্দ,
দেহের ভেতরে উঁকি মেরে কি দেখলে?
রত্নমণিকে মণি বলে না,
কঠিন তত্ত্বের কথা তিনি বলে গেছেন।

৫. তাম খাই-অয় বড় থাঙ্গই নুংজাক -
নাই।
জ্ঞান যোগ বাইসে সান্নাই হিন।
আর তামা বাই মাঞ্জুক নাই।
সাংনী সাক্তৈ হরিণি বাসাক

৫. কি করে কোথায় গিয়ে তার দেখা
পাবো।
জ্ঞান-যোগ সাধনে চাইতে হয়,
কি করে ঈশ্বরের প্রার্থনা করবো।
নিজের দেহের মতই হরির দেহ,

সাগ তঙ্গ নাই জাক- নাই।
মা প্রিথিমা আপা স্বর্গ
বিনি দয়া বিজাক নাই।
সাংনী কগ্ন সাক সিলিয়া,
পালক জাকখা নাই।
বাখানি কগ্ন কিব সিয়া,
সিনানি খাইব যাবৈ তুই অংয়া,
সি-ব সিয়া সিয়াই -ব তংইয়া,
কবর অংখা নাই।
থার বায় ন পালক জাখা,
দয়া তই নানাই কুরুই -খা।
তামা অংলাং খুসী কৃষ্ণ,
গোসাইং রত্ন নাই।

দেহেই অনেক জানবার আছে।
মা হচ্ছেন পৃথিবী, পিতা হলেন স্বর্গ,

তাদের কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে।
নিজের কথাকে নিজে জানলাম না
সবই ভুলে আছি।
মনের কথা কেউ জানে না,
জানতে চাইলে (পূর্ববিশ্বাস) আদিজ্ঞান
মতো হয় না।
অজ্ঞানী, অথচ নীরব থাকে না,
পাগলের মত মনে হয়।
মিথ্যে মায়ায় ডুবে আছে,
করুণায় উদ্ধারিতে কেউ আসে না।
খুসী কৃষ্ণের একি হলো?
গোঁসাই রত্ন এসেছেন,
উদ্ধারিতে এবার।

৬. তিল গ্রামণী বুদুক লাই
সাগ সুংজাক নাই।
পোষ্টাফিস থার খালাই অই,
চিঠি রনা ফাই।
হাকিম বাবু তিলি রখা,
পোষ্টাফিস কুতুক -গই তংখা।
তিলি বাবু বিচার লাগৈ
খবর মাংখা আই।
তিলিণী খবর থাংখা,
টিকেট মাষ্টার থুগৈই তাংখা।
হাকিম বাবু বেতন রিইয়া,
নাম কাটাইখা নাই।
কলিকাতা -নি সহর
পোষ্টাফিস ঠিক খালাই-অই,
পার্শেল রদি অর।
তামা তামা লাখন নাই নাই,

৬. টেলিগ্রামের তার হাতে নাও
তারপর নিজের দেহকে জিজ্ঞেস করো।
পোষ্টাফিস ঠিক করার পর
চিঠি দিতে এসো।
হাকিম বাবু টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।
পোষ্টাফিসে কাজ বেড়েছে।
টেলিগ্রাম বাবু বিচার নিয়ে,
খবর পেলেন সকালে।
টেলিগ্রামের খবর গিয়েছে,
টিকেট মাষ্টার ঘুমিয়ে আছে,
হাকিম বাবু বেতন দেন না,
নাম কেটে দেবেন।
কলিকাতা শহর -
পোষ্টাফিস ঠিক করে
সেখানে পার্শেল পাঠাও।
কি কি তোমার আনার দরকার

সাপ্তা ওয়াইসা নাই।
থার মালিয়া খুসী কৃষ্ণ
গুরু রত্ন সাকা বন:
গুরু কৃষ্ণ সব তর,
সিনিলিয়া নাই।

সপ্তাহে একবার চাইবে
খুশীকৃষ্ণ কিছুই বোঝে না।
গুরু রত্ন তাকে বলেছেন -
গুরু, কৃষ্ণে কে বড়,
দেখেও চিনতে পারলে না।

৭. খাসিয়া বাই ফাইজাক লাঙ্গই
থেকাই খা তগলাই।
বুফাং ওয়াফাং- ন সুঙ্গই নাইদী,
ই হান পাইতক -ইয়া খাই।
বিরক যত বিরগীয়া,
চারক যত চারগীয়া,
চারক বইয়া বিরক বইয়া
আর কাইসা যতনি দায় -নাই।
ইয়াকসী ইয়াগ্রা বাকসা খাইদি
কাচার বাইসে লারগাই তংদী।
সাকনি বাদে আর কুরুইখা,
সাক সবন নাই।
গুরু রত্ন কত সাকা,
এমাংব থার মাইয়া তংখা,
যে রমমানি ইয়াক তা হলদী,
খুসী কৃষ্ণ লাই।

৭. অজ্ঞানতায় এসে
ঝগড়া বিবাদ করে ঠকেছি।
এই পৃথিবীকে বিশ্বাস না করলে, গাছ
বৃক্ষলতাদিকে
জিজ্ঞেস করে দেখ।
উড়ন্তরা সব উড়ে না,
খাদকরা সব যায় না,
শুধু খাদকেরা নয়, উড়ন্তরাও নয়,
সেখানে সবাই দায়ে (কর্মশৃংখল)
বাঁধা।
বাম ডান একত্র কর,
মধ্যম এর সাথে লেগে থাক।
দেহ ভিন্ন সেখানে আর কিছু নেই,
দেহ কাকে চায়?
গুরু রত্ন কতবার বলেছেন -
স্বপ্নেও তুমি হদিশ পাবে না,
যাকে ধরেছ ছেড়ে দিও না,
ওরে, খুসী কৃষ্ণ।

৮. কাথানা -নি রিংইয়া খালাই
সালব মকল কানা।
জাল কুচুইঅ আ চবজাগৈ
যে চব -জাকখা আর চাবজাক -না।
সাকনি কংন সাকসা সিদি
প্রাণ বাই বাখা কাইসা খাইদী,

৮. মিশতে যদি না জানো
দিনেও তুমি অন্ধ।
ছেঁড়া জালেও মাছের মত ধরা পড়ে
যারা ধরা পড়ার তারা ধরা পড়েছে।
নিজেকে নিজে জানতে শেখো,
দেহ মন প্রাণ এক করো।

কও হামইয়ান সানানি খালাই
খুলুমখা আং অংদী মানা।
বাকসা বাকসা কত তংখা,
কাথাও রীয়ক চাগৈ নাই-খা,
অগ্নী সিংইয়া সাবাই ফাইমানি
আসুক কংন বক খানা।
যখন অংপ্রি কোই ফাইকা,
আসা চাগৈ কাবজা লাংখা।
এ ঞোয়াএ ঞোয়া কাবুখা খুসী,
কাই-সাব খালাইয়া মানা।
গুরু রতন কাইয়া ফাইকা,
মুকুতুই কুং-তুই হুজাক -জাখা,
তব-সে খাসিয়া আং,
বাই ফুগসে থিক অংজাক -না।

কুভাব যদি মনে আসে
বিনিত ভাবে এড়িয়ে যাও।
একসাথে কত রয়েছি,
ভাল মন্দ কত খেয়েছি,
মাতৃগর্ভ হতে না জিজ্ঞাসিয়া
কাকে ধরে এসেছ।
যখন আমি হাঁটতে শিখি
সাহায্যের আশায় কত কেঁদেছি,
খুশী ওয়া ওয়া রবে কত কেঁদেছে,
কেউ আসেনি প্রবোধ দিতে।
গুরু রত্ন দয়ালু।
অশ্রুজল দিয়েছে মুছে।
তবু তাঁকে চিনি নি,
কখন আমি মানুষ (জ্ঞান) হবো।

৯. আসুকদী (আচুকদি) নুংইয় বরক,
নুংজাকলাঙ্গই হামকা।
বলং হালাং বেরেই নাইবা
আই ফুরব থাম্কা।
নুং-ব আং, আং-ব নুং-সে,
বর আলকা আংখা।
সাগ তঙ্গ তই সক্তাম,
বকন কুনাই অংখা।
সকচা কুসুম (কসম্) সকচা কাচাক,
সকচা কুদুল, নাইদী বাখা।
নুং তংনাই নক বরব,
যত থার থাইয়া বাই থাংকা।
নুংসে জীব নুংসে শিব,
নিনি বিনি আর কুকইখা।
প্রাণবাই বাখা কাইসা খাইদি,
থাংইয়া জাগা অক অর থাংদী,
বিনি ইচ্ছা ফাই-নাই অংখা।

৯. সবাইকে ডেকে জড়ো করে খুশী
হলাম আমি
বনে জঙ্গলে ঘুরে দেখলাম,
কখন রাত পোহালো ?
তুমিই আমি আমিই তুমি,
আলাদা কোথায় ?
দেহে আছে তিনটি উপশাখা,
কোথায় ডুবে করব স্নান।
একটি উপশাখা কাল, একটি উপশাখা
লাল,
একটি উপশাখা সাদা,
চেয়ে দেখ মন।
তোমার ঠাঁই কোথায় বল
কেন লক্ষ্য বিহীন চল।
তুমিই জীব, তুমিই শিব,
তোমার তাহার সেখানে নেই।
প্রাণ আর মনকে এক করো,

হারি -তই খুসী কৃষ্ণ খিহক
হকগাই তংখা,
রত্ন গোঁসাই মুনুইস রিয়া,
মাথাই গোষ্ঠী ফাইকা।

না যাওয়ার জায়গায় যাও,
তাহার দয়া আসছে।
মেথরদের মত খুসীকৃষ্ণ মল পরিস্কার
করছে,
রত্ন গোঁসাই মনুষ্য নন
দেবকুল থেকে তাঁহার জন্ম।

১০. অংবাই (ঔং) প্রাণ-ণ যোগ খালাই-
অয়
মিসাই থাংদী সাংনী সাক।
আনি বাই নুং আইং খালাই -অয়
বাগৈ তংদী হর বাই সাল।
অজ পালাই বার সহজ
জপেয়াপ জপেজাক।
তিন কনাব বসুব সুবতাম,
বিনি থিনে কড়ই কারাক ।
কহিং বালায় বন মথর,
ববাই সে ব কবর চা-জাক।
ব তামাব-ব বিচার খাইদী,
ব বাই সে ফাই-অ বাসাক।
হানি চায়া খুসী লাই,
ব তামা-ব থার মায়া বায়।
গুরু রত্ন ছালাই সাকা,
বাবতই আং নাথং চাজাক।

১০, ঔ এর সাথে প্রাণকে যোগ করে
দেহ প্রাণ এক করো।
তুমি আমি এক মনে করে
দিন রাত্রি একত্রে থাক।
পালন করা খুবই সহজ,
জপ না করেও জপ করা হয়।
তিনটি কোণ, আর তিনটি কাঁটা,
তার কাছে নাই শক্তভাব।
এই পাতাটিই (কহিং) প্রাণকে ঘোরায়,
তাকে নিয়ে সবাই পাগল।
সেটা কি বিচার করো,
তার থেকেই দেহের সৃষ্টি,
জগতের অধম খুসী কৃষ্ণ,
সেটা কি তার হদিশ পায়নি বলে।
গুরু রত্ন কত জ্ঞান দিয়েছেন,
অথচ আমি কেন না শুনে রইলাম।

১১. ধর্মনি সাকাঙ্গ কাম,
সত্যনি সাকাঙ্গ কাম,
কুফুংকা নাি সদি লাম।
কাম-ন খাগৈ বেড়া মাংখলাই,
ই সংসারনি নাম।
কাম বাই ক্রোধ, লোভ বাই হিংসা,

১১. ধর্মের সামনে কাম,
সত্যের সামনেও কাম,
দেখ, পথ বন্ধ হয়ে আছে।
কামকে দমন করে যারা রাখতে পারে,
সংসারে তাদেরই নাম।
কাম আর ক্রোধ, লোভ আর হিংসা,

কাইছা-নি ছালাই কাইছা -ছে গর্জ্জা,
কাম-নি ইয়াফা মাঞ্জাক - খালাই,
ওয়াইসা বাই থানাই -ছে প্রাণ।
হরতই নবার বাংবার
যত সাগ নাং।
বিশ্বাস খালাইনাইসিদি বাখা,
কবর- দই,অং বাই লাং।
গুরু রত্ন যত সাকা:
থার মাইয়া বাই।
গুরাই -অয় তংখা।
আকুল করই খুসী কৃষ্ণ।
তামা ন নুং-লাং।

১২. বিরক সামান্য-ইয়া কিসি চাইয়া,
বাড়ী কারাক ছে।
গঙ্গা গয়া কাশী প্রয়াগ,
বিরগ্রী ইয়ালাইছে (ইয়াপালাইছে)।
আখাইব সাকাল-তই, আখাই -ব মাতাই-তই
বিনি ইচ্ছা ব ফাইমানি।
আদ্য শক্তি -ছে।
বিরক বাই তং মাংখালাই,
বিরক বাই চাম্মাং খালাই,
ই ভবের থৈলিয়া,
বিরগণি দায়-ছে।
তংতই তংতই তং মাইয়া -খাই,
চাতই চাতই চা মাইয়া খাই,
বিরক বাই মাঞ্জাক নাই,
সইলাতইয়া কারাক কারাক ছে।
গুরু রত্ন দয়াল অংখা,
বিরক-ন মানে-রই তংখা।
বরক চায়া খুসী কৃষ্ণ,
বিরং ইয়াপাই -ছে।

একটির চেয়ে আর একটি বড়।
কামের হাতে যদি ধরা পড়ো,
বেঘোরে প্রাণ যাবে।

আগুন বাতাস জল
সবার গায়ে লাগে।
বিশ্বাস রেখে চেয়ে দেখ মন,
কেন পাগল হচ্ছ?
গুরু রত্ন কতবার বলেছেন -
হদিশ না পাওয়ার কারণে,
ঘুর- পাক খাচ্ছো।
খুসী কৃষ্ণের আক্কেল নেই,
কাকে ডাকতে , কাকে ডাকছ।
১২. তারা সামান্য নয়, কমও নয়,
তারা শক্তিশালিনী,
গঙ্গা গয়া কাশী প্রয়াগ,
তাদেরই পদ চিহ্ন।
তারা একদিকে ডাইন, অপর দিকে দেবী,
তাদের ইচ্ছায় যাওয়া - আসা,
তারা আদ্যাশক্তি মহামায়া,
তাদের সংগে থাকতে পারলে,
তাদের সংগে খেতে পারলে,
এই ভবের সংসারে মৃত্যু নেই,
তাদের অসীম দয়ায়।
থাকতে থাকতে যদি আর থাকতে না পারো,
খেতে খেতে যদি আর খেতে না পারো,
তাদের হাতে ধরা পড়বে,
কুকুরের চেয়েও ভয়ঙ্কর তারা,
জেনে রাখো ইহা।
গুরু রতন দয়াল প্রভু
তাদের বশীভূত করেছেন
অনুপযুক্ত লোক খুসী কৃষ্ণ,
তাদের পদচিহ্ন মাত্র।

১৩. নন নুক জাগানো ওয়াইছা,
হরি মুং লাই খুকসা কুরুই,
বাখালাই বুকচাছা।
ইয়াথিয় জুতা কাখা,
ইয়াগ গড়ি খাখা,
বুখুরক (বখরক) থক মুতুম ফুলই,
তামা খাতুং খাসা।
মাইওং কড়াই রথা রথি
নাইখুং মুচাং তা নাইসিদি,
বাখাং বেক্রেং আলকা অঙ্গই
থাপলা চং চং সা।
রত্ন হিন বা তা নাইসিদি,
সাকনি সাকসে সত্য অংদি,
খাসিয়া তা অংদি খুসী,
আর যত মিছা।

১৩. একবার তুমি এর ফল ভোগ করবেই,
হরিনাম একবারও নাও না,
তোমার হৃদয় শূন্য
পায়ে জুতা পড়েছ,
হাতে ঘড়ি বেঁধেছ,
মাথায় সুগন্ধি তৈল মেখে
কি আনন্দ পেলে?
হাতি ঘোড়া চড়ে, রথী মহারথী সেজে,
আর সুন্দর হতে চেয়ো না।
মাংস, হাড় আলাদা হয়ে,
ভস্ম-স্তুপে রূপান্তরিত হবে।
রত্ন বলেন- এতসব আর চেয়ো না,
নিজেকে নিজে যাচাই করো।
খুসী, তুমি অবুঝ হয়ো না,
জগতে সব মিছা।

১৪. মিথিংজাক ই ভবের নাইদি সাকসব,
মান্নাই অংখা ই কলিয়
ছা মানলিয়া কিনি কিব।
বুরুই বাসাছে মানলিয়া,
কবর তা অং যতব।
কিবা রুংনাই, কিবা লানাই,
কিবা- নাই নাই, কিবা নুংনাই,
এমাং মুকথাং যত নুকজাক,
সাকনি সাকসে ব।
কাম বাই ক্রোধ, লোভ বাই হিংসা,
বরাও কাইবুরুই যত বাকসা।
কাম হিঞ্জাক -নাই আককল কুরুই,
মাখাং কারাক লাচিয়াছে ঝ।
তাখুক বুখুক বুরুই বাছা,
যত থানাই আলকা ওয়াইছা।
বাছাক সব ছিনিলিয়া,

১৪. জরা দুঃখভরা এই ভবের সংসারের দিকে তাকাও,
এই কলিতে কে পাবে পার
কেউ কারোর কথা বলতে পারছে না।
স্ত্রী -পুত্র পাওনি বলে,
পাগল হয়ো না।
কেউ জমায়, কেউ নিয়ে যায়,
কেউ চেয়ে থাকে, কেউ ডাকে,
স্বপ্নে আর বাস্তবে সবই দেখা,
সেটা এই দেহ-ই।
কাম আর ক্রোধ, লোভ আর হিংসা,
এই চার রিপু সমান সমান।
কাম নামে রিপুর আক্কেল নেই,
সে ভীষণ নির্লজ্জ।
ভাই -বোন, স্ত্রী-পুত্র,
একদিন পৃথক হয়ে যাবেই।

আং দুখীয়াব।
গুরু রত্ন সাকা বন,
থার মালিয়া খুসী কৃষ্ণ
গুরু সব, বৈষ্ণব সব, ছিনি মায়া ব।

নিজেকে নিজে চিনলে না,
আমি দু:খী মানুষও।
গুরু রত্ন বলেছেন তাকে-
খুসী কৃষ্ণ কেন বোঝনা,
গুরুই সব, বৈষ্ণবই সব,
কেন চেননা।

১৫. সব থানাই সব ফানাই
সাকনি সাগ নাই।
প্রেমনি কক বাড়াই অংখা,
ছিলিয়া তাকলাই।
প্রেমনি ককন থার মাইয়া ফুং
বাখা বিশ্বাস খাই।
বাখা বাখা হিসাব মাংখাই,
নুং তামান নাই।
কিয় (কেব) থার মান, কিয় থার মাঈয়া,
সাক-ন সব নাঈ।
কালী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কালী,
কাইছা সে বলাই
পাইতকখা বাকছা, পাইতকাইয়া বাগচী,
সব আন্দাজ খাই,
কাইছা-ন কুশল যত অংখালাই,
বিরছা সে থানাই,
ফারা ফারা সাকা রত্ন,
থিলাম-ব হল্লিয়া বন,
কপাল হামলিয়া খুসী কৃষ্ণ,
আর তামান নাই।

১৫. কে যাবে, আর কে আসবে,
নিজেকে নিজেই বুঝতে হবে।
প্রেমের মহিমা ভীষণ কঠিন,
কেন না বুঝে বিবাদ কর।
প্রেমের মহিমা সম্পূর্ণ না বুঝলেও
মনের উপর বিশ্বাস রাখতে হয়।
মনে মনে হিসাব পেলে,
তুমি আর কি চাও?
কেউ বুঝে, কেউ বুঝতে পারেনা,
নিজের দিকে নিজে কে চায়?
কালীই কৃষ্ণ, কৃষ্ণই কালী,
তারা এক ও অভিন্ন।
কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না,
কে তলিয়ে দেখে?
একজনের পথ-ই যদি সবারই হতো,
সব সমাধানে হতো।
বিপদ বিপদ - গুরু রত্ন বলেছেন,
গুহ্যদ্বারও তাকে দেয়া হয়নি,
খুসী কৃষ্ণের কপাল মন্দ,
এখানে তুমি কি চাও?

১৬.বাখানি মতে মান-খালাই বন,
প্রান বাই প্রাণন মিশায়ন।
দুর খালাইদি তিনি খানার
আনি কলঙ্ক-ন।
বক-ন লানাই, বক-ন তন্নাই,
বক-ন তিলাং-ন।

১৬. তাকে যদি মনের মত করে পেতাম
প্রাণের সাথে প্রাণ মিলিয়ে দিতাম।
আজ দূর করে দাও,
আমার কলঙ্কের কথা শুনাচ্ছি।
কোনটা নেব, কোনটা রাখব,
কোনটা পাথেয় করি?

সাকনি সাগসে মাঞ্জাক-গৈ তংগ,
আর সব ন,
হিংসা নিন্দা বক চালক-নই,
কাইসা ব হেইয়া আন।
সাল বাই হর বাই সাকা রত্ন
কাইসা ব ছিলিয়া বন।
সত্য খায়ই নাইদি খুসী,
গুরু নি কগন-ন।

নিজে নিজেই ভুগছি,
এখানে কাকে দেবো দোষ,
হিংসা নিন্দায় ডুবে আছি,,
কেউ আমায় সৎবুদ্ধি দেয়নি।
রত্ন দিন রাত্রি উপদেশ দেয়,
কেউ তাকে চিনতে পারেনি।
খুসী, ভাল করে বুঝে দেখ,
গুরুর উপদেশগুলি।

১৭.ওঁমা ওঁমা ওঁমা ওঁ।
নিনি বাদে আং তং মাইয়া,
নুং সব বাই তং।
মকল খুল্লুর যত তঙ্গই
খানইয়া নাথং।
ওঁ বিসিংইয় সাক কাইছা-ছে
নুং সব বাই তং।
নুং আংসে আংব নুংসে,
বড় আলকা তং।
যাবুইনি সালাই তাকসে যবর,
ছিনি মায়া আং।
রত্ন হিনবা-তা ছিরিদি,
বাখা লারুকই তং।
নাইতং লিগা খুসী কৃষ্ণ
হাদ্যাসে খাই পং।

১৭.ওঁমা ওঁমা ওঁমা ওঁ,
তুমি ছাড়া আমি থাকতে পারিনে,
তুমি কার সাথে থাকো?
চোখ কান সবই আছে,
তবুও অন্ধ বধির আমি।
ওঁ-র মাঝে একটি মাত্র দেহ,
তুমি কার সাথে থাকো?
তুমিই আমি, আমিই তুমি।
আলাদা কোথায়?
আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী
আমি চিনতে পারছি না।
রত্ন বলেন-ছেড়ে দিয়ো না,
মনে মনে পোষন করো।
খুসী কৃষ্ণ অবাক চোখে চায়,
গুরুর কি অসীম করুণা?

১৮.ফা রিয় হিনয় আসুক তা তংদি,
কবর দই আং বাই লাং নরক।
মা সে গর্জ্জা, ফা-সে গর্জ্জা,
তাখুক সবব নাইরুক।
বাসাক নি বাদে কুরুই আর
বাসাক সবব সিরুক।

১৮. পিতা দেন বলে চুপ করে থেকো
না,
তোরা কি পাগল হলে?
মাতাই শ্রেষ্ঠা পিতা-ই শ্রেষ্ঠ
ভাই কে রক্ষা করছে?
দেহ ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই,

বাসাক বাই বাকসা প্রাণ-ব তংগ,
আসুক দই খাসিয়া অংরুক।
রত্ন হিনবা-বুখুকনি ককয়া,
তাসে তা ছারী নাইরুক,
আর তাংপাইতক খুসী কৃষ্ণ,
গুরুনি ইয়াপাই-ন রমরুক।

দেহকে কে জানতে পারে?
প্রতিটি দেহের সাথে প্রাণও আছে,
এতই কি নির্বোধ হলে?
রত্ন বলেন-মুখের কথা নয়,
কোন মতেই ছেড়ে দিও না।
খুসী কৃষ্ণ আমিই বিশ্বাস, আমিই কর্ম,
গুরুর পদচিহ্ন অনুসরন করে চল।

১৯. আমা নুংসে সিয় যত কক,
বয়াং ব থাংলাখা বক।
বাখানি মতে নুংজাগৈ তংদি,
সাল বাই হর বাই,
তংফাই চকচক।
বাসাক-নি বাদে কুরুইখা আর
বাসাক-সে যত-নি নক।
প্রাণ-ন রমই সগই নাই-সিদি,
প্রাণ-সে সবাই হ:।
রতন তামাব ফাইলাং,
ছিনিলিয়া আংসে আংব,
মুংসা বন সিয়া খুসী,
গুরু বাক্য থাইসা-সেব।

১৯. মা, তুমিই সব কিছু জানো
কৈ কোথায় চলে গেলে?
আমার মনের মত করে ডাকতে দাও
দিন রাত্রি আমার কাছে বসে থাকো।
দেহ ছাড়া সেখানে কিছু নেই,
দেহ-ই সব কিছুর আশ্রয় স্থল।
মনকে ধরে পরখ করে দেখ,
হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।
রতন কেন এসেছিলেন?
আমি তাকে চিনতে পারলাম না,
খুসী তাকে বিন্দুমাত্র চিনতে পারেনি,
গুরু বাক্য এক অদ্বিতীয়, ইহা তুমি
জান।

২০. বাসাক সে পর্বত কাইসা, বড় থানাই নুং।
বাসাক বাসাক বাই বাসাক-ন রগৈ
নাই লাসি ফং।
বুরুই বাসা, তাখুক বুখুক,
যত আলকা ফং।
কালী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কালী,
সাগছে তং ফং।
সাইয়া হিংআ (হিনয়া) অংনা আমা

২০. দেহটা-ই একটা পর্বত, কোথায়
যাবে তুমি?
দেহের সঙ্গে দেহের বন্ধন
চেয়ে দেখ তুমি।
স্ত্রী পুত্র ভাই বোন
সবাই নাকি আলাদা,
কালী-ই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ই কালী,
দেহেই নাকি বিরাজমান।
গর্ভ ধারিণী মা কখনো ভৎর্সনা করেন

কবর তই তা অং।
রত্ন হিনবা-নাই লাদি,
তা সারিদি ফং।
বিমান (বিরমান)হামলিয়া খুসী,
খুলুম-মই তং ফং।

না,
পাগলের মত আচরণ করো না।
রত্ন বলেন, যাচাই করে গ্রহণ করো,
ধরলে ছেড়ে দিওনা।
হতভাগ্য খুসী কৃষ্ণ
তার উদ্দেশ্যে প্রনাম জানায়।

২১. সাধন খাই-কাই নুংনাই বন
কও মিসায়া ফং।
সাধ্য সাধন যত সাক
সাগসে তং ফং।
হিঙ্গলা পিঙ্গলা হিনয়,
বুদুক তংনই ফং।
সুসম্না বাই তিছা লাঙ্গই
সামুং তাংলাং ফং।
মানি অগ ঘুসুক তংখা
তামা তামা অংজা লাংখ্যা
ফাতার ফাই-অই বাই তিন সাধন,
ছিনিলিয়া অং!
রতন মুনুই সাকা-
কানা গুজাই ইয়গই থাংখা,
হানি চাইয়া খুসী কৃষ্ণ,
তামা তামা অং।

২১. সাধনা করলে তার সাক্ষাত পাবে
এ কথা মিথ্যা নয়।
সাধনা ভজন সবই নাকি
নিজের কাছেই।
হিঙ্গলা পিঙ্গলা নামে
দুটি লতিকা,
সুষুম্না দুটি মিলে
কর্ম করে যায়।
মাতৃ গর্ভে কতদিন ছিলে,
সেখানে কিরকম ছিলে?
জন্ম নিয়ে তিন সাধন কি?
বুঝতে পারলে না।
রতন হাসতে হাসতে বলেছিলেন -
অন্ধ, কুঁজো মানুষরাও পার পেয়ে
গেছে।
জগতের অধম খুসী কৃষ্ণ,
কি ই বা করেছেন?

২২. সামানি তংগালাক কক,
প্রাণ খুদুং সুক।
আকল খালাই বাসাক থানাই
হোদা দোক।
মকল খুল্লুর বুখুক বুকুং
বর্ড় থাংকা আইফু বক।

২২. প্রতিজ্ঞা বেশীদিন স্মরণে থাকবে
না,
সূতার মত ক্ষীণ এই প্রাণ।
হিসেব করে চলবে তুমি (দেহ বা মন)
এটা মিথ্যা কথা।
চোখ, কান, মুখ, নাক এতসব

বুরুই বাসা তাখুক বুখুক
নাইরুক-গই কাপনাই
আইফু খুক।
সগই সিকাই পাইছক-লাংখা
থাপালা পক পক।
রত্ন হিনকা - কুল মালিয়া,
ই ভবেনি কক্।
তা পালকদি (পকলাদি) খুসী কৃষ্ণ,
জন্ম জন্ম দক।

কৈ কোথায় তলিয়ে যাবে।
স্ত্রী-পুত্র, ভাই, বোন,
মরা কান্না কাঁদবে সবাই।
মরলে তুমি ভাই।
সৎকার করার পর সব শেষ,
শুধু ভস্মরাশির স্তূপ।
রত্ন বলেন - এই সংসার অপার অসীম
কুল কিনারা নেই।
খুসী কৃষ্ণ এই কথা তুমি ভুলনা
জন্ম জন্মান্তরে।

২৩. প্রেমনি কক সিয়া বাই নুং থাং।
কত থাংখা, কত ফাইখা,
বাবে-অয় বাবে নাইদি ওল ছাকাং।
প্রেম প্রেম যত হীন,
প্রেম তামাব সিয়া বন,
সিয়া কক-ন সির-নাইব
গোসাই রত্ন ফং,
তামা চালা, তামা বুরুই
বাবেই-য়ই নাইদি মুরুই মুরুই,
থানাই ফাই-নাই লাম খরচা-ছে,
নাইছন্দি লাং লাং।
অধম খুসী কৃষ্ণ চায়া,
প্রেম-নি কক-ন থার মালিয়া,
কাইনই জমা কাইছা অঙ্গই
আং ছাইচুং ফাইলাং।

২৩. প্রেমের মহিমা না বুঝেই চলে
গেলে।
কত গেল কত এল,
ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেখ।
'''প্রেম প্রেম'' যতই বলিনা কেন,
প্রেমের মহিমা জানি না।
অজানা তত্ত্ব-কথা যিনি বুঝিয়ে দিতে
এসেছেন,
তিনি গোঁসাই রত্ন।
কি পুরুষ, কি নারী,
গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখ।
যাওয়া-আসার একটি মাত্র পথ
দেখ, ইহাই ধ্রুব সত্য।
অধম খুসী কৃষ্ণ অকর্মণ্য,
প্রেমের মহিমা বুঝতে পারলে না
দু'টি দেহ এক হয়ে
আমি একাই এসেছি।

২৪. বীংন নাই-অয় তামা নুংন
সাক-নি সাগ নাইসিদি।
গাম হামইয়া যত কানাই

২৪. অন্যের তামাসা চেয়ে কি হবে ?
নিজেকে নিজে দেখ (বোঝ)।
ভাল মন্দ কাজে প্রলোভিত হবে মন,

বাখান-সে থাকরদি।
মকল কলনুই নাই নাই,
খুল্লুর কাই-নাই খানা-নাই,
বুখুক বাইছে চানাই,
চুকুং (বুকুং) বাইছে হলছিদি।
ই সংসার যেন নাই, গুরুনি দায় লামিদি।
গুরু রত্ন দয়াল অংখা -
নুংইয়া মানই নুংজাক বাই-খা,
আক্কেল কুরুই খুসী কৃষ্ণ,
ইজাং ওজাং তা নাইদি।

তাই মনকে বাঁধা দাও।
দু'চোখের কাজ দেখা,
দু'কানে শুনতে হয়
মুখের কাজ খাওয়া,
নাক দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।
এই সংসারে সর্বকাজে,
গুরুর উপর সব ছেড়ে দাও।
গুরু রত্ন সদয় হয়েছেন -
যা দেখিনি তা দেখেছি।
খুসী কৃষ্ণের আক্কেল নেই,
এদিক ওদিক চেয়ো না।

২৫. সাক্কাইসা সাক থানানি কালাই
রমসিদি গুরুনি ইয়াপাই,
ইয়াকসি য়াগ্রা তা নাইসিদি
সাংনি বাখা সাক সালামদি।
বুরুই বাছা তাখুক বুখুক,
থানানি ফুগ আলকা নাই বাই (থাংনাই)।
আপা স্বর্গ জন্ম রখা,
আমা মর্ত্ত্য অগ তুইখা,
তাখুক বুখুক মাইয়া নাংখা,
বাখা তমই পালক বাই।
গুরু রত্ন সাগৈ রখা-
বাখা বাখা থিক অংজাকখা,
হাদ্য খাইখা খুসী কৃষ্ণ,
যত গুরুনি দুয়াই।

২৫. নিজ দেহের যদি মুক্তি চাও
গুরুর চরণে স্মরণ নাও।
ডাইনে - বামে তাকায়ো না,
নিজের মনকে নিজেই ঠিক কারো।
স্ত্রী-পুত্র ভাই বোন,
যাওয়ার (মৃত্যু)সময় সবাই আলাদা
যাবে ভাই।
পিতা স্বর্গ, তিনি জন্ম দান করেছেন,

মাতা পৃথিবী, তিনি গর্ভে ধারণ
করেছেন,
ভাই বোনের মধ্যে মায়ার সৃষ্টি
করেছেন,
হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে পালন করেছেন।
গুরু রত্ন বলে দিয়েছেন-
মনকে ঠিক করো।
খুসী কৃষ্ণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে,
গুরুর দোহাই দিয়ে।

২৬. নীক তামান প্রেম দিনবাই (হিনবাই)।
গুরু বাক্য খুকচান
বাখাগ চোগই তং বাই।
প্রেম তুইব তুইয়া, প্রেম খগব (থকব)
থাগিয়া,
প্রেমন চাইব পাইয়া,
প্রেমন নুংগইব পাইয়া,
বাসুক লওখা বাসুক তরখা,
তামা অংখা নাই।
প্রেমন সিনি মান-খালাই,
কাইনি জমা কাইসা অংখাই,
কত প্রেম বাই থুই-অই থাংখা,
কত প্রেম বাই থাঙ্গই ফাইখা,
প্রেম-ন বাং সাফুং হাফচনই নাই বাই।
গুরু রত্ন কবর চাখা,
কিছিসা সাগৈ রখা,
খিলাম সিয়া খুসী কৃষ্ণ,
গুরুনি দুয়াই।

২৬. তোমরা কোনটাকে প্রেম বলো?
গুরু বাক্য, সত্য বাক্য, এক ও
অদ্বিতীয়,
সব মনে সঞ্চয় করে রাখ।
প্রেম মিষ্টিও নয়, সুস্বাদুও নয়,
প্রেমকে ভোগ করেও শেষ করা যায় না,
প্রেম পান করলেও শেষ হয় না,
প্রেমের বিস্তৃতি সীমাহীন
নির্ণয় করা যায় না।
প্রেমকে চিনতে পারলে,
প্রেমে দু'টি আত্মা এক হলে,
প্রেমে কত মরলোরে ভাই,
প্রেমে কত জীবন ফিরে পেল,
প্রেমের কোন কুল কিনারা নাই।
গুরু রতন প্রেমে পাগল হয়েছেন,
তিনি সামান্য মাত্র বলে গেছেন।
খুসী কৃষ্ণ গুহ্যদ্বারের মাহাত্ম্যও জানেনা
গুরুর দোহাই দিয়ে বলছে।

২৭. বাখা নুং তামা অংজালাং,
ইয়াকসি য়াগ্রা সব ফাইখা,
নাইখদি নুং খিলাং বালাং।
প্রাণ বাই বাখা রগৈ নাইদি,
আসুক দই নুং কববর অংলাং।
সাকসে আমা আপা গুরু,
সাকনি বাদে সব তংলাং।
প্রাণ নরগই প্রাণ লাসিদি,
প্রাণসে বকতই ফাইলাং।
সাল বাই হর বাই সাকা বাখা,
সাবাই খাই নুং পালক-জাখা।
গুরু রত্ন থার মাইয়া-ন ফুনগই রলাং।
কপাল হামিয়া খুসী কৃষ্ণ,

২৭. মনরে তোর কি হলো?
ডাইনে বায়ে কে এলো,
গুহ্যদ্বারের দিকে উঁকি দাও?
প্রাণের সাথে মনকে মিলিয়ে দেখ,
কেন যে পাগল হলে?
দেহ-ই মা, পিতা গুরু
দেহ ছাড়া আর কি আছে?
প্রাণকে ধরে প্রাণকে খোঁজ,
প্রাণ কোত্থেকে আসে?
দিবা রাত্রি প্রশ্ন করো,
উত্তর পেলে পালন করো?
গুরু রত্ন, যারা অবুঝ তাদের পথ
দেখিয়ে দিয়েছেন।

থার মালিয়া যত কওন।
যত গুরু দুয়াই নাংগ,
সাসিদি লাং লাং।

খুসী কৃষ্ণের কপাল মন্দ,
সব কথার মানে বুঝল না।
গুরু তোমায় স্মরণ করি,
খোলাখুলি বলো।

২৮. আচাই- খালাই ওয়াইসা থুই-নাই,
তা কিরিসিদি।
কিরি-অই পাইগালাক প্রাণ,
হরি মুংন লাছিদি।
হুনা বুনা লুমা লুতি
বলাই ন-বার-তই ওরি জাওক নাইদি,
সব থুইন সব হাম-ন ভাবে নাইসিদি।
বাখা যদি হামছক -খালাই,
হাম-ইয়া চাইয়া বন নুংখালাই,
মাখালান ইয়াকছি ইয়াগ্রা সব তর নাইদি।
রতন-নি ইয়াকংন নাই নাই,
বড় থাঙ্গই নুংজাক- ছিনাই
যেফুং ওংথুং খুসী কৃষ্ণ
তা ছারেছিদি।

২৮. জন্মিলে একদিন মরতে হবেই,
ভয় পেয়ো না।
প্রাণ ভয়কে করো জয়,
হরি নাম স্মরণ করো।
হুনা বুনা লুমা লুতি
বনের লতা পাতার মতো
বাতাসে উড়ে দেখ।
কে মরবে, কার ভাল হবে - ভেবে
দেখ।
মন যদি সত্যিকারের পরিষ্কার হয়,
বিপদে আপদে তাকে যদি স্মরণ করো,।
অশুভ করাল সব দূরীভূত হয়;
ঈশ্বর শক্তিমান।
রতন-এর পদচিহ্ন দেখে দেখে,
কোথায় জানি পাব তারে?
কপালে যাই থাকুক, খুসী কৃষ্ণ,
তুমি ছেড়ে দিও না।

২৯. আমায়-অই ডুম্বুর মাতাই, নুং তামা
নায়ই তং।
হাফুং হাতাই সাবাই রখা বলংনি মাই ওং,
ইয়াকছি ইয়াগ্রা হলংতই অ বিছিংয় বৈখা।
ফাতার সক-ফায়ই নাদি বাসুক তোয়ারী
অং,
সহস্র দ্বারা সারগাতে কত মাতাই হাসতে
হাসতে,

২৯. মাগো, ডুম্বুর দেবী, তুমি কেন সহ্য
করছ?
বন বাদার ধ্বংস করেছে বনের হাতী,
ডাইনে বায়ের পাথরের চাঁই এর মতই
সেও এখানে বাস করছে।
বাইরে এসে দেখ, কি বিরাট জগৎ,
সহস্র জায়গায় কত সুন্দর সুন্দর দেব
দেবী।

পূর্ব্ব গথুং মাণি জাগা পাইতোয়া তাঁ অং।
সম চাকুই হকচুং নাইমা চাগই নাগই নাইখা ফাপ্রামা,
বিনি খামা রিয়াং পাড়া বাসুক সুখাই তং
রাজ বাক্যনি মতে তঙ্গ গুরু রত্ন সাগই রগ,
খা সিলিয়া খুসী কৃষ্ণ-ই হানি অধম।

পূর্ব্ব ঘটনার জায়গায় এসে যেন আবার দুর্ঘটায় না পড়ি।
কটু ক্ষার, আগুনের ফুলকি -
খেয়ে দেখেছি ভীষণ কটু।
তার নি প্রান্তে রিয়াং পাড়া
কি সুখেই না আছে,
রাজার হুমুম মতই থাকি।
গুরু রত্ন বলে দিয়েছেন-
অজ্ঞান খুসী কৃষ্ণ, এই জগতের অধম।

৩০. আসুক কবর তা অংসিদি, নও পাড়ানি বরক রও,
আইচুক অংখা দুর্গা হিনদি দও।
বাওসা বাওসা কত তংখা কাথক রিয় চাগৈ নাইখা।
খিলাম তই আখলই থাঙ্কা বও।
আইচুক করাক দপর অংখা,
ওয়াবাম-ম কোকিলা পংখা।
সাতরাই হতরাই দুংখা নও,
আইচুকনি সময় থালাংকা,
তকজালা কুচুয়ই পাইখা, অন্নপূর্ণা লক্ষী দিনই,
মাইতুক চান্দি দও, নাইরক নুংয়া, রমই মাইয়া
বজাংব থালাংকা বও, গুরু রত্ন তামা অংন দও,
কাছখা কবনখা খুসী, কাইছাব রমলিয়া নাইদি
খানা- বাইদি আমা আপা নও।

৩০. এত পাগল হয়ো না, তোদের পাড়ার মানুষরা
সবাই দুর্গারি নাম লও, রাত শেষ হয়েছে।
কেউ কেউ অনেক আছে,
ক্রিয়া কর্মের নামে খেয়ে দেখেছে।
গুহ্যদ্বার দিয়ে সব বেরিয়ে গেছে।
উষার পরে দুপুর হলো
বাঁশ ঝাড়ের ভিতরে কোকিল ডেকেছে।
ধূপ-ধূনা দিলে তোরা,
উষাকাল অতিক্রান্ত হলো,
মোরগের ডাক শেষ হলো।
অন্নপূর্ণা, লক্ষীকে স্মরণ করো,
প্রসাদ (অন্ন) গ্রহণ করো।
দেখা যায় না, ধরা যায় না,
কোথায় গেল সে?
গুরু রত্ন না জানি কি হবে!
খুসী, অর্ধ পাগল হয়ে গেছে,
কেউ ধরতে (নাম) এলোনা,
মাতা, পিতা, তোমরা সবাই শোন।
ঈশ্বর নাম স্মরণ করো।

৩১. ধন্য ধন্য চন্দ্র শিখর অংখা,
সাকনি পাপ-ন পাইছগ রগৈ,
বার কুন্ড তুই কুখা,
শিব বাড়ী তই গুড়াই থাঙ্কা,
বীর পক্ষ কাগৈ নাই খনকা।
কত পার পর্ব্বত নদী নালা,
আর বঙ্গ সাগর নুখন খা,
সীতাকুন্ড হর চুং নাই তই।
কাগৈ থাংকা হাদুকনি লামতই গাজা গাঞ্জি
সেব জাগৈ,
তব শম্ভু নারন নুংবজাখা, শম্ভু নারনি
আখলই ফাইকা,
বরক সকনাইয় সকফাইকা সাদু বৈষ্ণব
বম বম হিনই,
থাপালান সাগ ফুলকা প্রেমতলাগ
সকফাইকা,
কত হরিনাম খানাক। গুরু রত্ন সাগৈ রাকনি,
যত ককব সত্য অংখা বেতাইং গাড়ী
সকফাইকা,
নবলক্ষ কুন্ড থাঙ্কা, সূর্য কুন্ড তই খুলুমই।
সহস্র দ্বারা বেরেয়ই ফাইকা কপাল হাম্মিয়া
খুসী,
বক সাধু ছিনি মানছি ই ভবেনি দু:খ সুখ,
কুল মানলিয়া তগলাই তংখা।

৩১. ধন্য ধন্য রব উঠেছে,
দেহের যত পাপ শেষ করে দিয়েছি,
বার কুন্ডের জলে স্নান করেছি।
শিব বাড়ী ঘুরে দেখে দেখে,
কত পাহাড় পর্ব্বত নদী নালা পার
হয়েছি,
সেখানে বঙ্গোপসাগরও দেখে এসেছি।
সীতাকুন্ডের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডের মত,
স্মৃতি জ্বল জ্বল করছে।
ঘন বন পথ দিয়ে, অনেক কষ্ট করে
দেখে এলাম শম্ভুর ওই পার,
শম্ভুর ওপার থেকে চলে এলাম।
মৃতদেহ সৎকার হওয়ার পর সাধু বৈষ্ণব
'বম বম্'
বলে চিতাভস্ম গায়ে মেখেছে, প্রেম
তলায় কে
এলো; কত হরি নাম শুনলাম। গুরু
রত্ন যা যা
বলে দিয়েছিলেন সবই সত্য।
সমস্ত পাপ মোচন হলো; সূর্যকে প্রণাম
করি। সহস্র
জায়গায় ভ্রমণ করে এলাম। খুসী
কৃষ্ণের কপাল মন্দ।
সাধু চিনতে পারলাম কৈ? এই
ভব-সংসারের সুখ দু:খের
সীমা নেই কলহ-বিবাদে মত্ত।

৩২. বাজার ফালকা নাইদি নও,
চতুর কাইসা তংখলাই,
কোও খোকসবসে বও,
আমা আপা নোগ তংখা।
নোও সাকাং তুলসী কাইখা,

৩২. বাজারে নাম বিলাচ্ছে , দেখ
তোমরা,
চতুর একজন আছে যে,
একটি নাম স্মরণ করে, মাতা পিতা
(আদি) দেখছে সে।

মে: মে: পুংরগাই, পুরন তাংখা বক,
খুসী চায়া অং থং,
রাজ্য বা চাবাই লাংছিতং,
মনুরই কুল মায়া
রত্ন তামা অংন দও।

বাড়ীর সামনে তুলসী গাছ রোপন করেছ,
মে মে রবে ডাকছে পাঁঠা,
পাঁঠা বলি দিচ্ছে তারা
ঈশ্বর বিরূপ হলেও।
রাজ্যেই তোরা খেয়ে বসো,
হাসি যে পায় মোর।
গুরু রত্ন কি যে হবে,
তুমিই জান প্রভু!

৩৩. নাম সংকীর্ত্তন

হরি নাম হরি নাম।
প্রথক খুলুমই রিংখা জয় সীতা রাম,
সীতা সতী স্বয়ং লক্ষ্মী-ই সংসারনি প্রাণ,
সাকনি বাদে আর করই সাগ হরি নাম,
বাসাক- নসে নানানি সাগ যত নাম,
যত অক্ষর রমৈ নাইখা সাগ থাক্তা প্রাণ,
ফারি কালাই রমছে রমছি ইচ্ছা খাইদি প্রাণ,
হরি কৃষ্ণ হরি নাম সর্ব্ব সিদ্দি যত কাম,
ই কলিয় হরি নামবাই রক্ষা অংনাই যত প্রাণ।
গুরু রত্ন দয়াল অংখা যত কগণ সাগৈ রখা,
মুসুক ঋালা খুসী কৃষ্ণ কব্বর দই অংলাং।

৩৩. হরি রাম হরি নাম,
শেষ প্রণাম জানিয়ে ডাক - জয় সীতা রাম।
সীতা সতী, স্বয়ং লক্ষ্মী, সংসারের প্রাণ,
দেহ ছাড়া আর কিছুই নেই,
দেহের ভিতর হরি নাম;
দেহকে জানতে হয়, দেহে যত নাম।
সব অক্ষরের অর্থ করে দেখেছি, দেহেই প্রাণের শেষ
যেভাবে পার ধরো, মনে প্রাণে পে'তে চাও,
হরি কৃষ্ণ,হরি নাম, সর্ব সিদ্ধি যত কাম।
এই কলিতে হরি নামে রক্ষা হবে যত প্রাণ
গুরু রত্ন দয়া করেছেন - যত তত্ত্ব কথা বলে গেছেন।
খুসী কৃষ্ণ এত ঋালাতন করছ কেন,
তুমি কি পাগল হলে?

মুক্তারাম

মুক্তারাম! তোমার কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। জীবনের চলার পথ এমনই নির্দয় যে অতি প্রিয় বন্ধুর কথাও সে ভুলে যায়। তোমার মত কত বন্ধুর কথাই ভুলে গেছি। হঠাৎ এখন কেন তোমার কথা মনে হল জানি না। মনে পরে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তোমার বিষয়ে আমি লিখে রেখে যাব। কিন্তু সে কথা আমি রাখতে পারিনি এই দীর্ঘ চৌচল্লিশ বৎসরের মধ্যে। মাঝে মাঝে লেখার কথা ভেবেছি, কিন্তু তোমার বিষয়ে এত কম ঘটনা আমার জানা যে তা দিয়ে লেখার কাঠামো আমি দাঁড় করতে পারিনি। কয়েকবার অনুরোধ করা সত্বেও পরবর্ত্তী সময়ে তুমি তোমার বিষয়ে আমাকে কিছু বলনি; কখনও মনে হয়েছে, তোমার ও তোমার গুরুদেব রতনমণির অবদানের কথা গুছিয়ে লিখতে পারলে একটি অতি সুন্দর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস লেখা যায়। কিন্তু আমার কল্পনা শক্তির সংগে কলম ও ভাষার বিরোধ অতি প্রবল, আমার অক্ষমতা আমার নিকট সহজেই ধরা দিয়েছে। বামন হয়ে চাঁদকে ধরার চেষ্টা আমি আর করিনি। তোমার কথা আমি ভুলে বসেছিলাম।

প্রথম জীবনের ভালবাসা, পঞ্চদশীর বিরহ যার থাকে, সে তাকে একেবারে ভুলে যেতে পারে না, বিলম্বে হলেও মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে। তুমিই একমাত্র নিরক্ষর সবল আদিবাসী যে আমাকে নিজ গুণে অকারণে বন্ধু বলে আপন করে নিয়েছিলে, তাই হঠাৎ আমার মনের কোণে এসে উদয় হয়েছে তোমার স্মৃতি।

জীবনের অন্তিম লগ্নে তোমাকে ভুলে যাওয়ার অপরাধ বোধ আমার মনে জেগে উঠেছে। একদিকে তোমাকে কথা দেওয়ার অপরাধ বোধ আমাকে পীড়িত করছে, অন্যদিকে আমার ভাষায় প্রকাশ করার শক্তির অভাব

আমার মনকে ক্ষত বিক্ষত করেছে, আবার মনে হচ্ছে সার্থক সাহিত্য রচনা করার শক্তি সকলের থাকে না। সত্য ঘটনার আশ্রয়ে কল্পনার রং মিলিয়ে মাধুর্যপূর্ণ ভাবে পরিবেশন করার ক্ষমতা আমার নেই। সত্য ঘটনা লিখে রেখে গেলেই বা ক্ষতি কি। তোমাকে যে আমি ভুলে যাইনি তার সাক্ষী কাগজের গায়ে বন্দী হয়ে থাকবে। তোমার মত করে কোন সরল আদিবাসী আমাকে বন্ধু ডেকে এমন আলিঙ্গন কখনো করেনি। তোমার হৃদয় বেদনার সামান্য অংশ যে আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম তা অক্ষয় হয়ে থাক।

তুইছারুবুহা ছড়ার ধারে পাহাড়ের চূড়ায় বসে তুমি আমার নিকট তোমার জীবনের চরম দু:খ ও বেদনার কথা আমাকে বলেছিলে। ভাষার দূরত্বের জন্য তার মর্ম আমি কতটুকুই বা গ্রহণ করতে পেরেছিলাম! তোমার জীবনকথা বলার আগ্রহ, সেই সংগে তোমার চোখে মুখে যে ক্রোধ, হতাশা মিশ্র মলিন হাসি, তার কিছু আভাষ এখনও আমার মনে আছে। তবু মনে হচ্ছে তোমার সব বক্তব্যের সামান্য অংশই আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম।

সেদিন বিকাল বেলায় তোমার অগ্নিদগ্ধ পরিত্যক্ত গৃহাঙ্গনে অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আভায় আমার মনের বীণায় তোমার সুরে বেজে উঠেছিল, কিছুই বলার ছিল না। সান্ত্বনার কোন ভাষা ছিল না। তবু আমার বেদনা অভিভূত মন ভাষায় প্রকাশ করেছিল, তোমার অন্তর্দাহের কথা আমি পত্রিকায় লিখব। তুমি কি বুঝেছিলে জানিনা। বিষন্ন হাসি দিয়ে বলেছিলে 'তাই লিখ''।

মুক্তারাম, আমি জানি, তোমার বিষয়ে কিছু লেখা বা না লেখার কোন মূল্যই তোমার নিকট নেই। বহুদিন তোমার সংগে দেখা নেই। তুমি এ জগতে আছ কিনা তাও জানি না। আমার মনের আকাশে ভেসে উঠছে তোমার স্মৃতি মুক্ত মেঘখন্ডের মত। রতনমণি সাধুর শিষ্য তসলমফার দলে তুমি আমি পা'দলে চলার ডুম্বুর পথযাত্রী। ১৯৪৬-৪৭ ইং সনের পৌষ মাস। পৌষ মাসের সংক্রান্তি মেলায় রতনমণির দলের শিষ্যদের জমায়েতে আমাদের উপস্থিত হতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি দলে থেকেও তুমি যেন একা। চেহারায়ও তুমি অন্য সকলের থেকে আলাদা, অন্যদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দেহী, দেহে মাংসের বাহুল্য নেই, গায়ের রং ও অন্যদের চেয়ে ফরসা। গালে বিরল দাঁড়ি, শুধু থুতুনির নিকট তার ঘন প্রকাশ। ঠোঁটের প্রান্ত ভাগের গোঁফ অতিরিক্ত ধূম পানের ফলে পিঙ্গল

বর্ণ। পড়ণে পাহাড়ী তাঁতে বোনা পাছরা। গায়ে পাহাড়ী হাতে বোনা কাপড়ের জামা। বিশ্রামের সময় সবাই যখন মাতৃ ভাষায় আলোচনায় মত্ত, তুমি তখন একা কোণে চুপচাপ বসে আছ, তোমাকে ঘিরে যেন এক নি:সঙ্গতার রাজ্য। আলোচনায় আমার কোন অংশ ছিল না, তাই বসে বসে তোমাদের আমি লক্ষ্য করতাম।

পৌষ মেলার আগে ৺রাজপ্রসাদ চৌধুরী (তসলাম ফা) পাঁচ ছয় জনের দল নিয়ে এসেছেন শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহকে ডম্বুর মেলায় নিয়ে যেতে। শচীন বাবুর অন্য কাজ থাকায় আমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি সেই দিনই বেলা ১১ টা বা ১২ টায় বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করলাম - পরণে কাপড়, গায়ে নীমা, পাঞ্জাবী ও কোট, পায়ে সেন্ডেল এবং কাঁধে একখানা কম্বল ও গামছা। এর বেশী শীতবস্ত্র নিলে যে আমাকেই সেগুলি বহন করতে হবে। দুপুর বেলা ট্রাকে মালপত্রের সংগে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে পৌঁছে গেলাম। পায় হেটে আমাদের যাত্রা শুরু হল। যে রাত্রে বাগমা গ্রামের কোন এক অদিবাসী সর্দ্দারের বাড়িতে আহার ও বিশ্রাম। পরদিন ভোরে বাগমা থেকে রওয়ানা হয়ে উদয়পুর শহরকে দূরে রেখে ৺ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের বাড়িতে পৌঁছলাম দুপুর বেলা। ৺ঈশান ঠাকুরের পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন মায়ের বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক। সেই সুবাদে দুপুরে ৺মায়ের মহাপ্রসাদ পেতে অসুবিধা হল'না। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে গর্জির সাল বনের ঘন অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশ বনের রাজত্বে প্রবেশ করলাম। ঘন শাল বনের শোভা দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এই শালবন স্থানে স্থানে এত ঘন শাল বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত যে ভরা দুপুরে সূর্য্য মাথার উপরে থাকা সত্ত্বেও স্থানটি সন্ধ্যা রাত্রির মত অন্ধকারে পরিপূর্ণ। দীর্ঘ পথ হাটার জন্য এই শীতকালেও শরীরে সামান্য ঘর্মবিন্দু। এইরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট শালবৃক্ষের স্থানটি অতিক্রম করার সময় এমন এক শীতল বাতাসের স্পর্শ অনুভব করেছি, যার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিনা। বৃক্ষের আভরণ দিয়ে ঘেরা, সূর্য্য কিরণের স্পর্শহীন ধরিত্রী খন্ডের শীতলতার এক অজানা অনুভূতির পরশ অনুভব করেছিলাম। মধ্যদিনের সূর্য্যালোকের উত্তাপের মধ্যে যে সন্ধ্যা রাত্রির অন্ধকার ও সেই সংগে ঠান্ডা হাওয়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে এই প্রথম আমি জানতে পারলাম। প্রকৃতি দেবীর রচিত এই শালবনে দেখতে পেলাম সহ অবস্থানের স্থান নেই। শালগাছ ছাড়া অন্যকোন গাছের অস্তিত্বই সে বনে নেই। সামান্য দু'একটি ভিন্ন জাতের গাছ যা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে, তাদের আকাশ

দেখার অধিকার নেই। মাটির সংগে কানাকানি করার মধ্যেই তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ। অন্য জাতের গাছ শাল বনে কোন প্রকারে নিজ অস্তিত্ব না রাখতে পারলেও, বিভিন্ন জাতের লতা নানাভাবে শাল গাছকে জড়িয়ে জড়িয়ে কাঁধ বেয়ে শাল গাছের মাথায় চড়ে বসেছে। লতাদের সংগে শালের মাখামাখির অভাব নেই। লতাদের এই গলা জড়িয়ে ধরার বেহায়াপনা লক্ষ্য করতে গিয়ে দেখতে পেলাম, লতারা এক জাতের নয়। নানা জাতের লতা, পাতার চেহারা আলাদা। বিভিন্ন গাছে যেমন বিভিন্ন জাতের লতা তেমনি পাতার রং-এর গভীরতাও বিভিন্ন। কোন লতা বয়সের ভারে প্রৌঢ় হলেও তনুদেহ ধারী, আবার কোনটি স্থূলাঙ্গী।

পরিশ্রান্ত আমি ঐ শালবনে বসে বিশ্রাম নিতে নিতে লতাদের কীর্ত্তি কাহিনী লক্ষ্য করেছিলাম। দেখতে পেলাম শাল গাছের সংগে পাল্লা দিয়ে লতা কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ শাল গাছের মাথার উপর দিয়ে সূর্য্য কিরণের সংগে খেলা করছে। পাশে বসা তসলমফাকে জিজ্ঞাসা করলাম পাহাড়ে এমন কত রকমের লতা আছে সে জানে কিনা এবং এই লতা কোন কাজে লাগে কিনা। তসলামফা জানাল লতাগুলি দেখতে হাতী বাঁধা দড়ির মত মোটা হলেও এরা কোন কাজে আসে বলে তার জানা নেই। আমার এই অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ওরা বোধহয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তখন এগিয়ে এল মুক্তারাম। সে সময়ে আমি তার নাম জানিনা। আমাকে সংগে করে একটু দূরে নিয়ে দেখাল এমন কয়েকটি লতা গুচ্ছ, যেগুলিকে দোলনার মত ব্যবহার করা যায়। প্রকৃতই এক শাল গাছ থেকে অন্য শাল গাছে যেতে একটি ঝুলে পরা লতায় চড়ে দোলনার মত ব্যবহার করা যায়। সে এমন একটি ঝুলে পরা লতার চড়ে দোলনার মত ব্যবহার করতে লাগল এবং আমাকেও লাফ দিয়ে চড়ার জন্য উৎসাহিত করল। আমি অস্বীকার করায় সে জোর করে আমাকে পাঁজাকোলা করে লতার উপর বসিয়ে দিতে চায় - চোখে মুখে দুষ্টামি ভরা তার হাসি। আমি আমার গাম্ভীর্য্য দিয়ে তার চপলতাকে শাসন করতে চেষ্টা করি। অন্যান্য সহযাত্রীরা হাসাহাসির ভিতর দিয়ে ঘটনা উপভোগ করে। আদিবাসী যুবকের এই গায়ে পড়া চপলতায় আমি যে সুখী হইনি তা বলাই বাহুল্য। কাজে লাগার নিদর্শনটি সে এইভাবেই প্রকাশ করল।

বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু হল। আমাকে এবং মিসিপ ঈশান চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে দেখাবার জন্যেই সহ যাত্রীরা এক উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সামনের দৃশ্য দেখতে সাহায্য করল। সম্মুখে কিছু পরিমান নিম্ন সবুজ

ভূমির পর দূরে সবুজ ঢেউ খেলান পাহাড়ের সারি। এর রূপ রাশি সকলের চক্ষু এবং মনকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করে, কিন্তু সে আনন্দের অনুভূতি পরবর্ত্তী সময়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা সকলের থাকেনা। আমারও নেই। আমার সহ যাত্রী তথাকথিত অশিক্ষিত আদিবাসীর মনে পাহাড় মালার অপরূপ রূপরাশি কি গভীর অনুভূতি জাগিয়ে দিয়ে গেছে! তারা আসা যাওয়ার পথে এই পাহাড়ের চূড়ায় বসে যে আনন্দ অনুভব করেছেন, আগন্তুক আমাদেরও সেই আনন্দের শরিকদার করেছেন। প্রকৃতির রূপের হাতছানি শিক্ষিত ও তথাকথিত অশিক্ষিত সকলের প্রাণেই সমপরিমাণে আনন্দ অনুভূতির শিহরণ তোলে, এবং সেই আনন্দের ভাগ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য ও আগ্রহ জাগে। তস্‌লামফা তাই তার অজানা সহজাত অনুভূতির প্রেরণায়, আমাদিগকে সৌন্দর্য্য জগতের দ্বারদেশে নিয়ে গিয়ে আমাদের যাত্রা পথের স্মৃতি ভান্ডার সৌন্দর্য্যের পুষ্পাঞ্জলিতে পূর্ণ করে দিল।

আমরা ধীরে ধীরে শাল গাছের রাজত্ব ছেড়ে মিশ্র গাছের রাজত্বে প্রবেশ করি। এখানকার বৃক্ষরাজি যে বিশেষ বৃদ্ধ নয়, হাল আমলের তা গাছগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, গাছের বয়সও যেমন বেশী নয় তেমন একক কোন গাছের প্রাধান্যও সেখানে নেই। মানুষের শাসন, শোষণ ও অত্যাচারে সহযোগীতার জন্যই বোধ হয় প্রকৃতিদেবী বিভিন্ন বৃক্ষ রাজির সহাবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। আমরা চলেছি, কোন প্রশস্ত পথ দিয়ে নয়, গভীর বনের ভিতরের পায়ে চলার পথ দিয়ে। প্রশ্ন করে জেনেছিলাম এই পথ অনেক ক্ষেত্রে তৈরী হয়েছে চলার অভিজ্ঞতায় এবং হাতি প্রভৃতি বন্য জন্তুর চলার পথকে অনুসরণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বন্য জন্তুর পরিত্যক্ত চলার পথকে গ্রহণ করে। প্রশ্ন করে একথাও জানতে পারলাম, আমাদের এই চলার পথে হাতি বা বাঘের দেখা পাওয়া তেমন অসম্ভব কিছু নয়। এতে ভয়ের কিছু নেই আমার সহ সাথীগণ বেশ দূর থেকেই বন্য জন্তুর গন্ধ অনুভব করে সময়োচিত সাবধানতা গ্রহণ করতে পারে। পাহাড়ে যারা বাস করে তারা নিজেদের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন শক্তিকে চেষ্টা বা অধ্যবসায়ের দ্বারা বৃদ্ধি করে এবং পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পাহাড়ে অবস্থানের বিপদকে অতিক্রম করার জ্ঞান বা শক্তি তাদের নিজেদের সহজাত প্রচেষ্টার ফল। অন্যথায় পরিবেশের সংগে সংগ্রামে তাদের পরাজয় হতো।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা বাঁশ বনে প্রবেশ করলাম। সূর্য্য তখন পশ্চিম

সীমান্তে পালাই পালাই করছে, আমাদের দৃষ্টির বাহিরে থেকে অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম আভায় আকাশ অকারণে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই রঙ্গিন আভা অদৃশ্য হল। বাঁশ পাতার আস্তরণের চাঁদোয়ার নীচে অন্ধকারের রাজত্বের ভিতর দিয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম, অনভ্যস্ত আমি প্রায় প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট্ খেতে শুরু করেছি। এপথ কোন প্রশস্ত পথ নয়। এই বাঁশের রাজ্যে একতা বড় গভীর। আমরা যাকে মুলিবাঁশ বলি এরা সেই জাতের। একটি বাঁশের শিকড় ফুড়ে অন্য বাঁশটি জন্ম নিয়েছে। দুটি বাঁশ গাছের তফাৎ এক বিগৎও নয় - এমন ঘন বসতিপূর্ণ বাঁশ রাজ্যের দেশ। মানুষের প্রবেশ রোধ করার জন্যই বোধ হয় বাঁশ বংশধরেরা এভাবে পাশে পাশে দাঁড়িয়ে দেয়াল তৈরী করেছে, আদিবাসী ভাইয়েরা একটি দুটি বাঁশ কেটে একজন লোক যাওয়ার মত পথ করে নিয়েছে। এই পথে একজনের পেছনে একজন যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমরাও একজনের পেছনে একজন চলেছি। এই অন্ধকারের মধ্যে তারা আমার দূরবস্থা অনুভব করে, বাঁশ বন থেকে শুকনা বাঁশ সংগ্রহ করে মশাল জ্বালিয়ে নেয়, এভাবে কতক্ষণ হেঁটে ছিলাম বলতে পারবনা, শেষ পর্য্যন্ত আমরা এক পাহাড়ের মাথায় টংঘরে আশ্রয় নিলাম।

টংঘরটি বেশ বড়। এক অংশে বাঁশের মাচার উপর একফুট পরিমান উঁচু মাটি, চারপাশ গাছের টুকরা দিয়ে বর্গ ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। এখানে দিনরাত ২৪ ঘন্টাই আগুন জ্বলছে। বড় বড় শুক্না কাঠের টুকরা বাহিরে জমা করা আছে। প্রয়োজন মত এনে, আগুন রক্ষা করা হচ্ছে। আবার রান্নাও এখানেই হচ্ছে। রাত্রে শীতের মধ্যে এই আগুনের চারিপাশে শোবার ব্যবস্থা। স্থানটি উদয়পুর মহকুমার দক্ষিণ মহারাণী অঞ্চলে। বিলোনিয়া এবং অমরপুর সাবডিভিশনের সীমানা বিশেষ দূরে নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদিগকে হাত পা ধোয়ার গরম জল দেওয়া হল। আমরা সবাই হাত পা ধুয়ে যখন আগুনের চারিপাশে বসলাম তখন আমার দেহে মনে কোন ক্লান্তি নেই। চার পাঁচখানা বাঁশের হুককা নিয়ে জনাদশেক লোক মাতৃভাষায় আলোচনা করছে। আলোচ্য বিষয়ের কোন আঁচই আমি করতে পারছিনা। বহু ছিলিম তামাক শেষ করার পর তাদের আলোচনা শেষ হল।

এবার তসলামফাদের সংগে আমার আলোচনা শুরু হল। আমার জানবার ছিল আমরা অমরপুর হয়ে ডম্বুর গেলাম না কেন। ডম্বুরে গিয়ে আমার করণীয় কি। আমরা ফেরার পথে কোন কোন গ্রামে যাব। কোথাও কয়েকটি গ্রামের লোক নিয়ে বড় সভা করা যাবে কি। ফেরার পথে অমরপুর হয়ে গেলে হয় না ইত্যাদি। উত্তরে জানতে পারলাম উদয়পুর থেকে অমরপুর যেতে হলে আমাদিগকে অনেক উঁচু পাহাড়ে চড়তে হত। এতে কষ্টও বেশী এবং সময়ও নিত বেশী। সংক্রান্তির পূর্বে ডম্বুর পৌঁছা যেত না। সে আরও বলে আমরা দল গঠন করতে যাচ্ছি, সেই বিষয় আমার নাকি জানা আছে। আবার নূতন করে জানা বা বলার প্রশ্ন আসে কেন? ফেরার পথে গ্রামে গ্রামে ঘুরেই আমাদের আলোচনা করতে হবে। কোন বড় সভা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু 'ফা অনেক কথাই আমাকে বলেনি।

আমার মনে আছে আমি কোন ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বসিনি, মুক্তা রামের স্মৃতি চারণ করতে কলম ধরেছি। কিন্তু প্রারম্ভিক কিছু কথা না বললে মুক্তারামের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবেনা। মুক্তারামের পিতা মাতার নাম আমি জানিনা। গ্রামের নাম ভুলে গেছি যদিও স্থানটি আমি দেখেছি। কিন্তু স্থানটি উদয়পুরে না অমরপুরে তাও ঠিক করে বলতে পারছিনা। তুইছারুবুহা ছড়ার পাশেই কোন টিলার উপর ছিল তাহাদের গ্রাম। মুক্তারামের বিষয়ে লিখতে হলে ঠিক যেভাবে পরিচয় ঘটেছিল সেভাবে প্রকাশ করা ছাড় অন্য উপায় আমার জানা নাই।

পরদিন ভোরে আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল। কিছুদূর যাওয়ার সেই পায় চলা পথকে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছড়া, ছোট পাহাড়ী নদী। এই ছড়ায় শীতকালেও বেশ জল। হয়ত কোথাও নামাবার জন্য ছড়ার বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন গামছা পরে ছ পার হয়েছে। ঈশান ঠাকুর মশাইও এক জনের পিঠে চড়ে ছড়া প হয়ে গেলেন। তসলামফা আমাকেও অন্য একজনের পিঠে চড়ে ছড়া পা হতে বলিল, যদিও দেখতে পেলাম গামছা পরে ছড়া পার হলেও আমার গামছা ভিজে যাবে তথাপি আমি গামছা পরেই ছড়া পার হবার জন্য তৈরী হই। আরো অনেকে আমাকে কাঁধে চড়ে ছড়া পার হতে অনুরোধ করল, আমি রাজি হইনি। বলা নেই কওয়া নেই এমন সময় হঠাৎ মুক্তারাম আমাকে পাঁজ কোলা করে উঠিয়ে নিল। অন্যরা সব হেসে উঠল। মুক্তারাম দুষ্ট হাসি হেসে বলল বন্ধু বন্ধুর পিঠে চড়ে ছড়া পার হতে পারে। আমি রাজি না হলে সে আমাকে এই ভাবেই ছড়ার উপারে নিয়ে যাবে ফলে

আমার শরীরের অংশ জলে ভিজে যাবে। বাধ্য হয়ে আমি তার পিঠে উঠে ছড়া পার হতে রাজি হলাম। এর পর থেকে মুক্তারাম আমাকে বন্ধু বলে ডাকতে শুরু করল। আমিও এই সরল আদিবাসীর একান্ত বন্ধুসুলভ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে বন্ধু বলেই ডাকতে শুরু করলাম। মুক্তারাম বাংলা বোধ হয় ভাল বলতে পারতনা সেজন্য আমার সংগে বিশেষ কথা বলত না। তা হলেও এরপর থেকে আমার সংগে ওর এক সহজ মাখামাখি হয়ে গেল।

ডম্বুর সফর শেষ হয়ে গেছে। ফেরার পথে এক এক গ্রাম বা পাড়ায় একরাত্র ঘুমিয়ে আলাপ আলোচনা করে অন্য পাড়ায় যাচ্ছি। সব পাড়াই রিয়াং পাড়া, এক এক পাড়ায় সর্ব্বোচ্চ ৭/৮ ঘরের বেশী ঘর বা বাড়ি নেই। ঘরে আসবাব বলতে অতি সামান্য জিনিষই আছে। রান্নার আসবাব পত্র সবই প্রায় মাটির। দু একটি এলুমিনিয়ামের বাসন আছে। শীতের পোষাক ? প্রত্যেকের একখানার বেশী চাদর নেই। চাদর অবশ্যই তৈরী হয়েছে চরকায় কাটা জুমের তুলোয় এবং হাতে বোনা কোমরে বাধা তাঁতে। এই তাঁতে বোনা কাপড়ের প্রশস্ততা দেড় হাতের বেশী নয়। তাই দেড়হাত পাশ চার বা পাঁচহাত লম্বা দুখানা পাছড়াকে মাঝে শিলাই করে চাদর তৈরী করা হয়েছে। রাত্রে পাঞ্জাবী কোট গায় দিয়ে একখানা কম্বলের অর্ধেক নীচে দিয়ে এবং বাকি খানা উপরে গায়ে দিয়ে অগ্নিকুন্ডের নিকটে শুয়েও মাঝরাতে সেখানে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় প্রচন্ড শীতে, সেখানে ওরা খালিগায়ে মাত্র একখানা চাদর গায়ে দিয়েই শীত কাটিয়ে দেয়। টংঘরের শর মাচার উপর শুওয়া। মাঝ রাতে নীচ থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস ও সেই সংগে ছেচা বাঁশের বেড়ার হাওয়া মহল দিয়ে শুর শুর করে আসা বাতাস আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। তারা তখন বেশ আরামে ঘুমায়। আমি এর মধ্যে দেখেছি চরম দারিদ্র। বসে খাওয়ার জন্য কোন থালা গ্লাস নেই, আছে প্রকৃতির দেওয়া কলাপাতা, লাউ জাতীয় ফলের খোসার হাতা, গ্লাস, জলের জগ। ঘরে ধান ও মাচার নীচে জমানো বাঁশের লাকড়ি সামান্য লবণ ও সুট্‌কী মাছ ছাড়া জমানো কোন দ্রব্য নেই বললেই চলে। কোন কোন ঘরে অবশ্য এক তারা বা দু তারা বাদ্যযন্ত্র, বাঁশী বা ঢোলক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে। প্রতিদিনেই চাউল আসে গাইল সেকাইটে ধান ভাঙ্গার পর, শাকসব্জি আলু আসে প্রকৃতির নিজহাতে বোনা নিকটবর্তী টিলা বা বন থেকে। এরা সব ভোলানাথ শিবের শিষ্য, এই প্রাচুর্য্যেই এরা সন্তুষ্ট। তবে অনেকেই জুমে ও বাটির আঙ্গিনায়, নীল, লাল ও

কাল রং করার মত গাছ ও মরিচ গাছের চাষ করে। এছাড়া কিছু মসল্লাপাতির গাছও সেকালে দেখেছি। এইসব গাছ দেখতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মরিচ গাছের মতই। লবণ, সুট্‌কী মাছ ও সামান্য কিছু মেয়েদের অলংকার ছাড়া বাজার থেকে কিনে আনার প্রয়োজন তাদের নেই। ৺রতনমণির কৃপায় এরা মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু এরা গাঁজার ধোয়া পান করে, এবং সেই গাঁজা তারা নিকটবর্তী জুমেই চাষ করে।

এই যাত্রায় আমি ১৫ দিনের উপর দিন রাত্রি ওদের সংগে বাস করেছি। রতনমণির বিদ্রোহ বা আন্দোলন বিষয়ে আগরতলা থেকে যে তথ্য জেনেছি, তার বেশী কোন ঘটনাই এদের নিকট হতে জানতে পারিনি। এদের অনেককেই রাত্রির অবসরে, গল্পের ছলে নানাভাবে প্রশ্ন করেছি, রায়কাঞ্চন কেন জরিমানা করল, রায় কাঞ্চনের দলের সর্দারেরা কি ধরণের অত্যাচার অবিচার করেছে, এদের কারোর নিকট হতেই ঘটনা সহ কোন কারণ যুক্ত উত্তর পাইনি। যখন কোন একটি জানা ঘটনা উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করতাম, এই ঘটনা কি সত্য? তখন এদের উত্তর হত তুমি ত সবই জান আবার আমাকে প্রশ্ন কর কেন? এরা কেহই কারণ দেখিয়ে আমাকে বলতে পারেনি, সে নিজে কেন এবং কিভাবে এই আন্দোলনের সংগে যুক্ত হয়েছে বা শাস্তি ভোগ করেছে। এতে আমার ধারণা হয়েছে আন্দোলনের বিস্তারিত ব্যক্তিগত ঘটনাও ওরা ভুলে বসে আছে শুধু কিছু কিছু প্রধান ঘটনাই তাদের মনে আছে।

আমি সে সময়ও বুঝে উঠতে পারিনি এবং এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনা তসলামফা এক সংগে কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং মিসিপ ৺ঈশান ঠাকুরকে নিয়ে ডুম্বুর মেলায় উপস্থিত হলেন কেন? যদি কংগ্রেসের প্রচার বা বাণী শুনাবার কাজই প্রধান হয় তবে মিসিপ ৺ঈশান ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিলনা। পরবর্তী কিছু তথ্য জানার পর আমার ধারণা হয়েছে তসলামফা তার সুক্ষ্ম সহজাত রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রয়োগ করেছে দলকে বাঁচাবার তাগিদে। পুঁথিগত বিদ্যা তার জানা না থাকলেও আন্দোলনে অংশ নিয়ে তার রাজনৈতিক বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। এই দলের নেতা ৺তসলামফা যিনি ৺রাজপ্রসাদ চৌধুরী নামে পরিচিত। এই বুদ্ধি প্রয়োগের কৃতিত্ব তার বলেই আমি মনে করি।

অরুন্ধুতি নগরের মিশনারীদের সংগে তসলামফা- দের কি সম্পর্ক তা সেই সময় বা তারপরও সে আমাকে বলেনি। আমি পরে জেনেছি রাজ অনুগ্রহে বঞ্চিত - রতনমণির দলের লোকেদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পর

তারা বাধ্য হয়ে মিশনারীদের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে ১০,০০০ টাকা ধার নিয়ে ছিল। মিশনারীদের পক্ষ থেকে ঐ সময় চাপ দেওয়া হচ্ছিল হয় টাকা শোধ কর নয়ত খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর। আমি সেই সময় অন্যান্য সঙ্গীসহ মিসনারী সাহেব এবং মেমদের এই অঞ্চলের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গ্রমণ করতে দেখেছি। বহুবার তাদের সংগে পথে আমাদের দেখা হয়েছে। সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে সদ্য এসে তারা অমরপুরের গভীর অরণ্যে ধর্ম প্রচার করতে দেখে আমার তাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছে।

ৎতসলামফা প্রকাশ না করলেও আমাকে এবং ৎঈশান ঠাকুরকে ডম্বুর নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল শক্তিরায় রিয়াং। শক্তিরায় ছিল প্রচন্ড উগ্রবাদী সেনাপতি। রতনমণি দারোগা দীনেশ বাবুকে ছেড়ে দেওয়ার পরও শক্তিরায় চেষ্টা করেছিল দারোগাকে ধরে শাস্তি দেওয়ার জন্য। আমাদের সংগে আগরতলায় পরিচয় হওয়ার পর দেখেছি শক্তিরায় সেই সময়ই রাজার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করার পক্ষে ছিল কিন্তু তসলামফা বুঝে শুনে দলকে আরও শক্তিশালী করে কাজে নামার পক্ষে ছিল। শক্তিরায় ডম্বুরের পৌষ মেলায় কোন ভাবে গন্ডগোল পাকানোর মতলবে ছিল। পরে অমরপুরের দারোগা বাবুর নিকট হতে এই অভিমতের সমর্থন পেয়েছিলাম। সেই সংগে তার এই ইচ্ছাও বোধহয় ছিল যাতে ৎতসলামফা নেতৃত্ব থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ৎতসলামফা সম্ভবত: চেয়েছিল পৌষ স্নান যাত্রা উপলক্ষে বিচ্ছিন্ন রতনমণির শিষ্যদের একত্রিত করতে, আর শক্তিরায় চেয়েছিল ঐ জমায়েতে রাজ সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে। ৎতসলামফা বুদ্ধিমানের মত, মহারাজ নিযুক্ত মিসিপকে সংগে রেখে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল কোন প্রকার গন্ডগোল পাকানো তাদের উদ্দেশ্য নয়, এবং মিসিপ মহাশয় উপস্থিত থাকলে শক্তিরায়কে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারবেন। আমার উপস্থিতির প্রয়োজন এইজন্য যে ভবিষ্যতে কংগ্রেস তাদের সংগে থেকে তাহাদিগকে সাহায্য করবে তাহা প্রমান করা। ৎতসলামফা সেই সময়ে বেশ বুদ্ধিমান বিবেচকের মতই কাজ করেছে। পরবর্তী সময়ে আমার প্রতি শক্তিরায়ের বিরূপ মনোভাব, আমার অভিমতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আমি ৎতসলামফার বক্তব্য শুনে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি, কিন্তু শক্তিরায়ের বক্তব্য থেকে সে যে ঠিক কী চায়, তা বুঝে উঠতে পারিনি। উগ্রপন্থী শক্তিরায়ের পক্ষে বিশেষ কোন সমর্থকও পরে দেখিনি। কিছুকাল পর শক্তিরায় লংতরাই এর সর্ব উচ্চ পাহাড়ে বাস করে সেখানে মন্দির স্থাপন করে সাধুর মতই বসবাস করতে

থাকে। অন্যান্য অনেকের মত শক্তিরায়ও ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছে।
রতনমণির সেই স্বদেশী আন্দোলনে বা বিদ্রোহে সাড়ে সাত জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল। আমার সংগৃহীত তথ্য একটি প্রবন্ধ লেখার মত নয়। আমি বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ এবং ঘটনা প্রবাহ জানার জন্য রতনমণির শিষ্যদের সংগে নানা ভাবে আলাপ করেছি কিন্তু নূতন বিশেষ কিছুই জানতে পারিনি। মৃত সাড়ে সাতজনা এই জন্য যে একজন গর্ভবতী মহিলারও মৃত্যু ঘটেছিল, গর্ভস্থ শিশু আধা জন। আমি মুক্তারামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি সেও কিছু বলতে পারেনি। আমার সোজাসুজি প্রশ্ন তুমি কেন রতনমণির শিষ্য হলে, তোমার তো তেমন বয়স ছিলনা। আমার সংগে আলাপে সব সময়েই তার মুখে হাসি লেগে থাকত। সে হেসে বলল সবাই হয়েছে সেই জন্যই হয়েছি। আবার বলেছে সর্দ্দারদের অবিচার ও অত্যাচারে ও জরিমানায়। কিন্তু সর্দ্দারদের অত্যাচার কি জন্য বলেনি বা বলতে পারেনি। এদের অধিকাংশেরই জমিজমা নেই তাই জমি নিয়ে মারদাঙ্গা নেই। তথাপি এত বিচার ও জরিমানা কেন? এত বড় বিদ্রোহের কারণ আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না।
মুক্তারাম এখন সাধু। ঘন ঘন গাজার ধূম পান করে। সন্ধ্যা বেলা একতারা বাজিয়ে রিয়াং ভাষায় রতনমণির দলের গান করে, সংগে অন্যরাও গান করেন। ফেরার পথে আমরা একদিন এক পাড়া বা গ্রামে যাই, সেখানে বিকালে আলোচনা হয়। আমি বাংলায় বলি। এরপর ওরা আলোচনা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ওরা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেই।
একদিন মুক্তারাম হেসে হেসে বলল আজ আমরা নূতন গ্রামে যাব। খাওয়া দাওয়ার পর এক পাড়ায় যাব সেখানেই কথা হবে। হেসে হেসে সে বলে - আজকের সভা হবে নূতন ধরণের। দুপুরের খাওয়ার পর আমরা দুজনে রওয়ানা হয়েছি। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে বেলা কত হয়েছে তার হিসাব নেই। পাহাড় বেয়ে চলতে চলতে মুক্তারামের হাসি ও কথাগুলি হেয়ালীর মত মনে হচ্ছে। আমি তার বলার ধরণে তেমন মনোযোগ দেইনি। সেদিন এই চলায় আমার নিজকে বেশ পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। আমি বলি আর কতদূর, সে বলে এই এসে গেছি। কিছু দূর চলার পর সে বলে ঐ যে সেই পাড়া। আমি অপ্রস্তুত, ঘর নেই বাড়ি নেই কিছু বড় বড় গাছ। পরে নজর করে দেখেছি আম কাঁঠাল গাছ। আমি মনের রাগ গোপন করে বললাম এ কোথায় নিয়ে এলে? সে মিষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল 'এই তো সেই গ্রাম'। আমার তখন রাগ সামলানই কঠিন হয়ে পরেছে। এত

দীর্ঘ পথ হাঁটার পর এই জঙ্গল দেখিয়ে বলছে গ্রাম! আমি একটু রাগত স্বরেই বললাম 'এরকম ঠাট্টার মানে কি?' মুক্তারাম একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল - এই যে আমার পূর্ব বাড়ি। তুমিতো আমাকে বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, এখানেই সেই বাড়ি। তুমি কি রাগ করেছ? আমি ক্রোধ দমন করার চেষ্টা করলাম। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না মুক্তারাম তার পুরাতন গ্রামের নিকট পৌঁছে বাস্তুভিটা না দেখে ফিরতে পারছেনা। তার পুরাতন স্মৃতি তাকে এখানে জোর করে টেনে নিয়ে এসেছে। আমার সংগে আলাপে তার পুরাতন বহু কথা মনে পরেছে, সে মনে করেছে আমি যেহেতু তার বাড়ি ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করেছি সেজন্য তার পূর্ব বাড়ির প্রতি তার নব আবিস্কৃত বন্ধুরও আগ্রহ আছে। সেই কারণেই সে একমাত্র আমাকে এখানে এনেছে, এবং রহস্য করে একে আলোচনা সভা বলে বলেছে। ক্রোধ এমনই বস্তু তাকে একেবারে লুকিয়ে ফেলা যায় না। আমার অসুন্তুষ্টি মুক্তারামের নিকট ধরা পরে গেছে। তবু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললাম, রাগ করব কেন আমাকে আগে বললে খুশী মনেই আসতাম ইত্যাদি বলে তাকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্ঠা করলাম। আন্দোলনের শেষ পর্বে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলে রাজসৈনিক বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর তারা আর এ গ্রামে আসেনি।

জানি না এর পূর্বে কতবার এসে মুক্তারাম তার হারান বাড়ি ঘর দেখে গেছে। পাহাড়টি আমরা কোন কথা না বলেই ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের মধ্যবিন্দুর চারিপাশে প্রায় গোলাকার উঠানের পরপারে পাঁচ ছয়টি ঘরের ভিটির অস্তিত্ব এখনও আছে। ঘরের প্রবেশ অংশে মাটির ভিটি তার পরের অংশ ছিল মাচার উপর অবস্থিত। এই ধরণের গৃহের পরিকল্পনা এখানেই আমি প্রথম দেখলাম। এর পূর্বে সদরের আদিবাসী কিছু গ্রামে আমি ঘুরেছি। সেখানে অধিকাংশ সম্পন্ন আদিবাসীর ঘরের ভিটি মাটির। আর যাদের মাচাং ঘর বা টংঘর তাদের সবটাই টংঘর। এমন ভাবের প্রথম অংশ মাটির ভিটি পরবর্তী অংশ সমসুত্রে মাচাং এর ব্যবস্থা আমি দেখিনি। বড় বড় আম কাঁঠাল গাছ দেখলেই বুঝা যায় গ্রামটি বেশ পুরাতন। জুমিয়াদের মত এরা ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করেনি। যদিও বন তুলসী এবং ছনের মত ঘাসে আঙ্গিনা ভরে আছে তবু একটি ক্ষেত্রে দেখলাম ঘরে উঠার সিঁড়িতে কয়েকটি পাথর বসান আছে। সেখানে আমরা দুজনে বসলাম।

কি কথা দিয়ে আমাদের প্রথম আলাপ শুরু হল তা এখন মনে পড়ে না। কল্পনা দিয়ে সে বিস্মৃতি পূরণ করার চেষ্টা করব না। যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত পরিবেশে তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছিল। সে অনেক কথা বলে গেছে। তার সব বক্তব্যের অর্থ সে সময়ও আমি ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছি। তার বিবাহের পূর্বে স্ত্রীর সংগে কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হল এমন রসাত্মক প্রশ্নও করেছি। সে এই সব লঘুতার উর্ধে তার বক্তব্য বলে গেছে। তার সেদিনের প্রকাশ ভঙ্গীতে কখনও ক্রোধ কখনও অকারণ চঞ্চলতা সেই সংগে বক্তব্যের অস্পষ্টতা আমাকে এত মুগ্ধ বা অভিভূত করেছে যে আমি তার বক্তব্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারিনি। তার প্রেয়সী স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা এবং এই প্রেমের বিচ্ছেদকারী দস্যুর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রবল বাসনা তখনও তার মনে অম্লান হয়ে আছে। এই কাহিনী শুনে দু:খে বিস্ময়ে আমার মনে আঘাত লেগেছিল। যদিও সব বক্তব্য আমি বুঝতে পারিনি। কারণ উত্তেজনায় সে রিয়াং ভাষাতে কথা বলছিল। দু-একটি পরিচিত শব্দ শুনে, প্রশ্ন করে বাংলায় উত্তর পেয়েছি, তারপর আবার কথা শুরু হয়ে গেছে রিয়াং ভাষায়। তার অনুভূতির গভীরতায় স্থান ও কালের মাহাত্ম্যে আমি ক্রোধে, বিস্ময়ে, সহানুভূতিতে তার সংগে একাত্ম হয়ে বিহ্বলতায় কিছু সময়ের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

মুক্তারাম কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিল। আমি বুঝে সবকথা মনে রাখতে পারিনি। পরে আমি প্রশ্ন করেছি সে উত্তর দিয়েছে, যেভাবে আমার মনে আছে সেই ভাবেই প্রকাশ করছি। মুক্তারামের মনে পরার কাল থেকে সে এই পাড়াতেই বাস করছে। দূরে কোথাও যায়নি। মাঝে মাঝে হাটবার দিন বাজারে গেছে। সেখানেই একদিন তার ভাবী বধুর সংগে দেখা হয়। কিছুকাল পর ঘর জামাই হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। প্রায় এক বৎসর পর নিজ পাড়ায় চলে আসে। সুখেই তাদের দিন কাটছিল। হঠাৎ সর্দ্দারেরা বিচার করতে আসে। বিচার করে জরিমানা করে তার স্ত্রীকে নিয়ে যায়। অর্থ জরিমানা করা হয়েছিল কিনা তার মনে নেই। এই ঘটনায় সে প্রায় পাগলের মত হয়ে যায়। সে জানতে পারে তার স্ত্রী অমরপুরে এক সর্দ্দারের বাড়িতে আছে। তিনি লেখাপড়া জানা রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত, সরকারী চাকুরে। সমাজে বিশেষ ক্ষমতাবান, বিচার করা বন্দিনী এমন বেশ কিছু মেয়ে তার বাড়িতে নাকি আছে। মুক্তারাম তার স্ত্রীকে দেখার জন্য অমরপুরে ঐ সর্দ্দারের বাড়ির পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকত। তার স্ত্রীর সংগে দেখা

হলে তাকে নিয়ে সে জঙ্গলে পালিয়ে যেত। তার স্ত্রীকে বাড়ীর বাহিরে আসতে দেখেনি। তারপর তার ইচ্ছা হল ঐ সর্দ্দারকে কেটে ফেলবে। কিন্তু সুযোগ পায়নি। এই সময় সে কোথায় খাওয়া দাওয়া করেছে, কোথায় ঘুমিয়েছে কিছু মনে নেই। তার এক বন্ধু তাকে খুঁজে পেয়ে রতনমণির নিকট নিয়ে যায়। গুরুদেব তাকে উপদেশ দেয়। তারপর সে কয়দিন ঘুমিয়ে কাটায়। তখন মন শান্ত হয়। পরে সে আন্দোলনে যোগ দেয়। আন্দোলনের সময় সে দল সহ ঐ সর্দ্দারকে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সর্দ্দারকে ধরতে পারেনি। ঐ সর্দ্দার তখন পাহারা সহ অমরপুরে থাকত।

এই সরল পাপশূন্য পত্নী প্রেমে বিভোর নবলব্ধ বিরহী বন্ধুর বেদনায় আমার সহানুভূতি জানানোর ভাষা নেই, করণীয়ও কিছু নেই। সে কারণেই বোধ হয় হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এল, বন্ধু! তোমার এই মর্ম বেদনার কথা আমি লিখব।

রতনমণির শিষ্যদের যখন জিজ্ঞাসা করতাম তোমরা রায় কাঞ্চন এবং তার সহযোগী সর্দারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলে কেন? তারা উত্তর দিত সামাজিক বিচারে ঐ সর্দ্দারের দল আমাদিগকে ২০,০০০ টাকা জরিমানা করেছিল।' কিন্তু এই সামাজিক বিচারের কি কারণ বা কোন অপরাধের জন্য করা হয়েছিল, তার আশানুরূপ উত্তর আমি তাদের নিকট হতে পাইনি। শুধু ক্রোধভরে সংক্ষেপে বলত অন্যায় বিচার। মুক্তারামের এই আত্মজীবনীমূলক বিবৃতি আমাকে আলোর সন্ধান দিয়েছে। সামাজিক বিচারের ধরণ এবং মূল কারণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল, সেই কারণ অতি আদি কারণ, ইন্দ্র সহস্র যোনি বা চক্ষুর অধিকারী হলেন গৌতম ঋষির শাপে, কারণ তিনি অহল্যার প্রতি হাত বাড়িয়েছিলেন। রাবণের শ্রীলংকা ছাড়খার হয়ে গেল কারণ রাবণ সীতাকে জোরপূর্বক হরণ করেছিলেন। দোর্য্যোধন অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ স্ববংশে নিহত হলেন কারণ তারা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে চেয়েছিলেন। হোমারের ইলিয়াড কাব্যে ট্রয় নগরী ধ্বংস হল কারণ ট্রয় রাজকুমার হেলেনকে হরণ করেছিলেন। রতনমণির আন্দোলন বা বিদ্রোহ দমন করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজ। সংগ্রামে তাদের আপাতত পরাজয় হলেও রিয়াং রাজা বা রায় কাঞ্চন ও তার চেলা চৌধুরীদের (সর্দার) বিচার ক্ষমতার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল, কারণ তারা সামাজিক বিচারের নামে অন্যের একাধিক স্ত্রী হরণ করেছিলেন। সব ঘটনার পরিসমাপ্তি প্রতিশোধ ও পরাজয়ে। যুগে যুগে একই ধরণের ঘটনার পূণরাবৃত্তি হচ্ছে চলমান সমাজের সংগে সংগতি

রেখে এবং ভবিষ্যতে হয়ত হবে। পুরুষের লালসার আগুন থেকে সীতারা কি কোন কালেই রক্ষা পাবেনা?

রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেও শেষ পর্য্যন্ত সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। মুক্তারাম তার সীতাকে ফিরে পেলে অবশ্যই তাকে গ্রহণ করত। সে কি তার সীতাকে ফিরে পেয়েছিল? আগরতলা ফিরে আসার সময় মুক্তারামকে বার বার অনুরোধ করেছিলাম আগরতলায় আসলে আমার সংগে দেখা করার জন্য। কিছু কাল পর মুক্তারাম আগরতলায় এসেছিল এবং আমার বাসায় গিয়ে আমার সংগে দেখা করে বন্ধু বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরেছিল। তখনও মুক্তারামকে নিয়ে রতনমণির বিদ্রোহের ঘটনা লেখার বিষয় আমার মাথায় ছিল। এবং এ বিষয়ে আরো বহু তথ্য তার নিকট থেকে জানার ছিল - যেমন তার পাড়ার নাম কি, শ্বশুর বাড়ি কোথায় কত দূর ছিল? সেই সর্দার বাহাদুরের নামটি কি? কি কারণে তার বিচার হয়েছিল। জামাই খাটার সময় সে কি বৌকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল? এ ধরণের অনেক ঘটনাই লেখার আগে জানার প্রয়োজন। প্রারম্ভিক কিছু আলাপ আলোচনার পর আমি কৌতুহল বশত: মুক্তারামকে প্রথমে প্রশ্ন করলাম, তার সেই স্ত্রীকে সে পেয়েছে কিনা। মুক্তা রাম গম্ভীর হয়ে গেল, তার পর জিব কেটে বলল, ' বন্ধু এসব কথা নয়। সাধুর এসব কথা বলতে নেই।' মুক্তারাম রতনমণির শিষ্য জানতাম কিন্তু সে যে এমন সাধু হয়ে গেছে তা আমার জানা ছিল না। এরপরও বেশ কয়েকবার তার সংগে আমার দেখা হয়েছে, কিন্তু তার নিকট হতে তার স্ত্রী বা আন্দোলনের বিষয়ে কোন তথ্যই জানতে পারিনি। সাধু মুক্তারাম কি তার পূর্ব প্রেয়সীর স্মৃতিকে বিসর্জন করে দিয়েছে?

এর প্রায় আঠাশ বৎসর পর আমি রতনমণির বিদ্রোহের ইতিহাস কিছু লিখেছি, 'দৈনিক সংবাদে' সরকারি কিছু চিঠি পত্র ছাপানোর পর। বিস্তৃত ঘটনা বর্ণনায় রতনমণির শিষ্যদের অবদান অতি সামান্য। ইতিহাসের যারা পাত্র পাত্রী তারা ইতিহাস লিখে রেখে যান না, সমকালীন বা পরবর্তী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরাই ইতিহাস রচনা করে।

মুক্তারামের নিকট কথা খেলাপের অভিযোগ থেকে আমি এখন মুক্ত। আমি আর দায়বদ্ধ নই। সব কারণের প্রধান কারণ এর ইঙ্গিত দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেও বক্তব্য থেকে যায়। আমার সিদ্ধান্ত যে সত্য তার নিশ্চয়তা কি? ভাতের হাঁড়ির একটি ভাত সিদ্ধ হয়েছে দেখে সব ভাতই সিদ্ধ হয়েছে, এই যুক্তি এখানে টিকে না বলে কেউ মন্তব্য করতে পারেন। আমার এই

অভিমত ঘটনার বিচারও বিশ্লেষণের পরিণতি।

রিয়াং বিদ্রোহের যে একাধিক কারণ আছে তা আমি পরবর্ত্তী নিবন্ধে উল্লেখ করেছি। প্রধান কারণ রায় ও চৌধুরী গণ দরিদ্র রিয়াংদের নিকট হতে অন্যায় ভাবে সামাজিক বিচারের নামে জরিমানা ও অর্থ আদায় করত। এই সব চৌধুরীগণ নিজেরা সামাজিক বিধান লঙঘন করত, কিন্তু সেই সব বিধান লঙঘনের জন্য দরিদ্র রিয়াংদের নিকট হতে বিচারের নামে অর্থ আদায় করত। রতনমণির শিষ্যগণ হিসাব করে দেখতে পায় ১৯৪৩ ইং পর্যন্ত ঐসব সর্দারগণ খগেন রায়ের (রায়কাঞ্চন) সমর্থনে ২০৪২৫ টাকা জরিমানা আদায় করেছিল। সেই সময় একজন নিম্ন কেরানীর বেতন শুরু হত মাসিক ১০ টাকায়। কাজেই জরিমানা ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকার উর্দ্ধে হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে দেখলে বিচারের সংখ্যা ২০০০ এর কাছাকাছি হওয়া বিচিত্র নয়। বহুকাল পর্য্যন্ত আমার এইসব বিচার এবং বিচারের কারণ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। রতনমণির শিষ্যদের প্রশ্ন করেও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। মুক্তারামের ঘটনা জানার পর আমার অনুসন্ধানের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি হয়। অন্য সূত্রেও মৌখিক তথ্য সংগ্রহ করি। আমি গভীর ভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি সেই গ্রাম্য আদিবাসীরা (রিয়াং ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের আদিবাসী গণও) আমার নিকট গ্রাম্য সামাজিক বিচারের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে বলতে চায়নি। বরঞ্চ লুকাবারই চেষ্টা করেছে। ১৯৪৮ সনে কোন এক আদিবাসী গ্রামে (রিয়াং সম্প্রদায় নয়) আমি কয়েকদিন বাস করেছিলাম সেই সময় ঐগ্রামে বেশ জমকালো এক বিচার সভা বসেছিল। তিন দিন ধরে ভিন্ন গ্রামের একাধিক সর্দার সহ মদ ও মাংসের ভোজ খেয়ে বিচার সভা করা হয়েছিল। আমার নিকট কেউ মুখ খুলেনি। পরে বহু চেষ্টা করে আমি সেই বিচারের বিবরণ জেনে ছিলাম। বিচারের বিষয়বস্তু ছিল নারীঘটিত অবৈধ মিলনের কাহিনী। এই আলোচনায়, অপ্রাসংগিক হলেও আমি না লিখে পারছিনা যে বিচারের রায়ে বিবাহিত মহিলার সাজা হয়েছিল, পুরুষ বেকসুর খালাস পেল। প্রথম ধাক্কায় এই বিচারের রায়ে আমার হাসির উদ্রেক হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী বিশ্লেষণে আমার ধারণা হয় বিচার নায্যই হয়েছে। আমাদের নাগরিক সমাজের পেনালকোড অনুযায়ী নারী ভোলানোর দায়িত্ব পুরুষের, কিন্তু আদিবাসী মাতৃ প্রধান সমাজে পুরুষ ভোলানোর দায়িত্ব মহিলার। কাজে কাজেই আদিবাসী রীতিনীতি অনুযায়ী নায্য বিচারই হয়েছে।

রিয়াং সমাজেও সেই কালে সমাজের শৃঙ্খলা রাখার জন্যে অনেক প্রচলিত

নিয়ম ছিল যা তারা শ্রদ্ধার সংগে পালন করত। সমাজের প্রধান অংশে আছে নারী। তাকে কেন্দ্র করেই পরিবার, সমাজ গড়ে উঠেছে। পুরাতন আদিবাসী সমাজে জমির মালিকানা নিয়ে কোন সমস্যাই ছিলনা। যদি বা কোন সমস্যার সৃষ্টি হত, তাহলে বিরাট পাহাড় অঞ্চলে স্থানের অভাব নেই, গ্রামসহ বাসস্থান পরিবর্ত্তন করলেই হল। সমস্যা ছিল বিবাহ নিয়ে, বিবাহের জন্য ঘর জামাই (চামারি) নিয়ে, বিবাহ ভঙ্গ নিয়ে আর ছিল অবৈধ মিলনের সমস্যা নিয়ে।

ত্রিপুরার রিয়াং সমাজ গড়ে উঠেছিল মহারাজের নিয়ন্ত্রণে রিয়াং রাজা বা রায় রাই বা রায় কাঞ্চনকে নিয়ে। রিয়াং রাজার কোন ভৌগোলিক সীমানা ছিলনা। অধিকার ছিল রিয়াং সমাজের কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষা করার এবং সেই সংগে চিরাচরিত রীতিনীতি অনুযায়ী সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করার। এছাড়া সরকারী কিছু খাজনা আদায়ে ও রায়দের অধিকার ছিল। রায়কে সাহায্য করার জন্য যুবরাজ বা চাপিয়া খাঁ, উজির বা কাঁচাক, নাজির বা ইয়াকছুং ছিল। রাজ মর্য্যাদার পরিপূরক রাজ পুরোহিত থেকে শুরু করে ঢোল বাদক, সানাই বাদক প্রভৃতিও ছিল। রায়ের অনুমোদন ক্রমে পাড়ার দফার বা মহল্লার সর্দ্দার বা চৌধুরী নিয়োগ করা হত। বহু যুগ হতে রিয়াং সমাজের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি অনুযায়ী এইসব সর্দ্দারগণ নানা ধরণের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য শাস্তি বিধান করত। কিন্তু এই ঐতিহ্যবাহী রিয়াং সমাজ নানা কারণে অন্যসব আদিবাসী সমাজ থেকে পশ্চাদপদ ছিল। নিরীহ সরল, ধর্ম ভীরু হিসাবেই তাদের পরিচয় ছিল।

মাতৃ প্রধান আদিবাসী সমাজে পুরুষের চেয়ে মহিলারাই সাংসারিক কাজে বেশী পরিশ্রম করতেন। রিয়াং সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। জুমে ফসল লাগান থেকে ফসল সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করায় তাদের অবদান বেশী। পর্দা প্রথার দাপট নেই, তারা গৃহবন্দিনী নয়। জুমে ফসল লাগান থেকে ফসল সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করায় তাদের অবদান বেশী। পর্দা প্রথার দাপট নেই, তারা গৃহবন্দিনী নয়। স্ত্রী পুরুষের মেলা মেশার অবাধ স্বাধীনতা আছে। তথাকথিত সতীত্বের শুচিবায়ু নেই। কিন্তু তারা উশৃঙ্খলও নয়। সমাজের বিধানে আইন করে প্রাপ্য অধিকার ও দায়িত্ব নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক নীতি লঙ্ঘন করলেই সর্দ্দারগণ সমাজের পক্ষে বিচার করতেন। বিচারের শাস্তি জরিমানা বা কায়িক দন্ড। এ শাস্তি অপরাধ সংশোধনের জন্য, নির্যাতনের জন্য নয়। মানুষের সব বিচারই নির্ভুল নয়, রিয়াং সমাজও ব্যতিক্রম ছিলনা। সামাজিক অধিকাংশ বিচারই ছিল নারী

ঘটিত - প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে। সর্দ্দারগণের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে 'রায়ের' নিকট আবেদন করার সুযোগ ছিল। রিয়াং সম্প্রদায়ের দুইজন মিসিপ ছিলেন আগরতলায়। তারা মহারাজ দরবারের সংগে রায়ের যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে সর্দ্দার ও চৌধুরীগণ সরাসরি মিসিপের সংগে যোগাযোগ করে নিজেদের অভিযোগ নিবেদন করতে পারত। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রিয়াং সম্প্রদায় শান্তির সংগেই বাস করে এসেছে।

এই ত্রিশের দশক থেকেই পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। এই সময়ের পূর্বেও রিয়াং রায় এবং কিছু চৌধুরীগণ সমতলে ধানি জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ বাস শুরু করেছিলেন। ত্রিশের দশকে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে শুরু করল। ব্যক্তিগত জমির মালিকানার সংগে সংগে তার আনুসংগিক দোষে দুষ্ট হতে লাগল। জমি আবাদ করে চাষ করার জন্য অতিরিক্ত শ্রমিকের প্রয়োজন। অতিরিক্ত শ্রমিক সংগ্রহ শুরু হল রিয়াং সম্প্রদায় থেকে। সমাজে ঘুনে ধরার সূত্রপাত তখন থেকেই। কম মজুরীতে, বা বিনা মজুরীতে সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ বা শোষণ এইভাবেই রিয়াং সম্প্রদায়ে শুরু হল। স্বল্প বা বিনা মজুরীতে কাজ করতে অস্বীকার করলেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ বা বাধ্য করার জন্য সামাজিক বিচারের অপব্যবহার শুরু হল। বিরাট খামারের নানা কাজের জন্য, নিজের বৈভব প্রকাশের জন্য বা ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করার জন্য একাধিক বিবাহ বা রক্ষিতা রাখা শুরু হল। এই সমস্ত সর্দ্দার চৌধুরীদের কিছু সংখ্যক ছেলেরা লেখাপড়া শিখে, রাজ সরকারের তহশীলে বা অন্য কোথাও চাকুরী গ্রহন করেছে। তাদের কেহ কেহ যতখানি না লেখাপড়া শিখেছে তার চেয়ে বোধ হয় বেশী লক্ষ্য করেছে রাজপরিবারে একাধিক বিবাহ বা রক্ষিতা রাখার রীতি এবং সেই সংগে আনুসংগিক দোষ। অথবা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বলে আর্থিক সংগতি বৃদ্ধির সংগে সংগে এইসব সর্দ্দার চৌধুরীদের এক অংশের কামনা বাসনা প্রবল হতে শুরু করল। দূর্জ্জনের ছলের অভাব হয় না। সামাজিক বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহারও শুরু হল।

রিয়াং সমাজে বিধবা বিবাহ, বা স্বামী পরিত্যক্তার বিবাহের নিয়ম আছে, কিন্তু এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিবাহের বিধান নেই। এর অর্থ হচ্ছে এরূপ কোন অনাত্মীয় নারী রাখা ও অবৈধ। রায়ের সহযোগীতায় এক ধরণের সর্দ্দার বা চৌধুরী একাধিক বিবাহ করল কিন্তু অন্য কোন সর্দ্দার বা ব্যক্তিকে একাধিক বিবাহের কারণে বা অভিযোগে সাজা দেওয়া হত

অর্থাৎ জরিমানা করা হত। সম্ভবত কতক সর্দ্দারের পুত্রগণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ হতে মুক্তি পেত, অন্য ব্যক্তির পুত্রের নাম মাত্র অপরাধে অধিক জরিমানা হত। সব সর্দ্দার চৌধুরী যে এমন অন্যায়কারী ছিলেন তা নয়।

এদিকে রতনমণি সাধু ১৯৩৪-৩৫ সন থেকে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে অমরপুরে আসা- যাওয়া শুরু করেছেন। এই ভক্ত সাধুর ধর্ম উপদেশে অনেকে তাঁহার শিষ্য হতে শুরু করেছে। এই শিষ্যদের মধ্যে এক ধরণের সৎ সর্দ্দার ও চৌধুরীরা যেমন ছিল তেমনই রিয়াং চৌধুরী ও সর্দ্দারদের দ্বারা নিপীড়িত রিয়াংগণও ছিল। রতনমণির প্রভাব বৃদ্ধির ফলে ভাবী রায়ের ক্রোধ আরো বৃদ্ধি হয়। নব মনোনীত অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক শিক্ষিত রায় বা সম্ভাব্য রায় কাঞ্চন এর পক্ষের সর্দ্দার চৌধুরীদের বিচারের জুলুম আরো বেড়ে যায়।

মুক্তারামের স্ত্রী হরণের বিচার একটি বিশেষ ঘটনা। মুক্তারামের জীবনের করুণ পরিণতিই আমাকে রিয়াং বিদ্রোহের ঘটনার গভীরে যেতে প্রেরণা যোগায়। ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রিয়াং' পুস্তিকায়, তিন বৎসর জামাই খাটা (চামারি কামি) অবশ্য কর্ত্তব্য বলে লেখা হয়েছে। কিন্তু আমি আমার ১৯৪৬-৪৭ ইং সনের ভ্রমণ কালেই শুনেছিলান উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতিতে জামাই খাটার সময় কমান যায়। যদি আমরা ধরে নেই যে মুক্তারাম এক বৎসর জামাই খাটার পর সস্ত্রীক পিত্রালয়ে পালিয়ে এসেছিল এবং সেই জন্যই তার বিচার হয়েছিল; তবু এক্ষেত্রে বিচারকগণ জরিমানা করতে পারেন, তার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে দিতে পারেন বা সহানুভূতিশীল হলে মুক্তারামকে অবশিষ্ট সময় জমাই খাটতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু বিচারের নামে বিচারকের বাড়িতে আসামীর স্ত্রীকে রাখার উদ্দেশ্য যে কি তাহা লেখার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরণের একাধিক ঘটনা যে ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'রতনমণি ও রিয়াং বিদ্রোহ' লেখার পূর্বে আমি আগরতলায় কিছু নেতৃ স্থানীয় ঠাকুর ও কর্ত্তা ব্যক্তি এবং মহারাজের ঐ সময়ের কয়েকজন খাস কর্মচারীর সংগে দেখা করে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাদের অনেকেরই অভিমত ছিল অল্প কিছু সংখক চৌধুরী বা চৌধুরী পুত্রের নারী ঘটিত কার্য্যাবলী ও অপরাধের বিচার না হওয়াই রিয়াং বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। এই কারণ সামাজিক বিচারের একটি অঙ্গ বলে পূর্ব লেখায় আমি বিস্তৃত উল্লেখের প্রয়োজন অনুভব করিনি। মুক্তারামের করুণ কাহিনীর সংগে আনুসংগিক ভাবে এসে গেল ।

মুক্তারামের সূত্র ধরেই প্রথম জেনেছিলাম - রিয়াং বিদ্রোহীগণ গৃহহীন হয়ে অভাবের তাড়নায় আগরতলার অরুন্ধুতি নগরের খৃষ্টান মিশনারীদের সাহায্যপ্রার্থী হয়। সে নিজ থেকে আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলেনি, যে ঘটনার পরিণতিতে আমি বিষয়টি জানতে পারি তাই এখানে লিখছি।

আমাদের পরিক্রমার পথে একদিন সন্ধ্যায় রিয়াং পাড়ায় পৌঁছি। পরদিন ভোরে পাশের টংঘরে গানের আসর বসে। মুক্তারাম মূলগায়েন গলার সুর শুনে আমি বুঝতে পারি। পূর্বেও তার গান শুনেছি। আমার উপস্থিতিতে গান বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় পেন্টসার্ট পরা এক যুবক আসরে উপস্থিত হয় এবং মুক্তারামের সংগে রিয়াং ভাষায় বেশ ক্রুদ্ধস্বরে বাদানুবাদ শুরু করে। মুক্তারাম বিনীত ভাবেই কথা বলছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অতি বিমর্ষভাবে গান গাওয়া বন্ধ করে দেয়। মুক্তারামের মলিন মুখ দেখেই আমি অনুভব করতে পারি এই গানগুলি রতনমণি দলের রচিত গান। তাদেরকে সেই গান করতে বারণ করা হচ্ছে। ঐ সময় আমার পরিক্রমার পথে দুইবার বিদেশী মিশনারীদের বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখেছিলাম। প্রশ্ন করে জেনেছিলাম যে তারা নিউজিল্যান্ডের মিশনারী। দলে দু'জন পুরুষ মিশনারী এবং একজন সদ্য আগতা মহিলা মিশনারী। অন্যরা ত্রিপুরার সহসাথী ও মালবাহক। অনুসন্ধানে জানতে পেরেছিলাম তারা একদিকে চিকিৎসা করছে এবং অন্যদিকে খৃষ্টধর্মের প্রচার করছে। তার প্রভাব কতটুকু আমার জানা ছিলনা। এই ঘটনায় আমার উৎসুক্য বৃদ্ধি হয়। ঐ পাহাড়ের উপরে বসতবাটি অর্থাৎ টংঘর গুলির অদূরে আরও একটি টংঘর দেখতে পেলাম। জানতে পারলাম এটি চার্চ এবং লেখাপড়ার স্থান, এবং সংলগ্ন ছোট টংঘরটি ঐ যুবকের বসবাসের স্থান। সে প্রয়োজনমত চিকিৎসাও করে।

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে মুক্তারাম ও চক্রফাকে প্রশ্ন করে এবিষয়ে তথ্য পেয়েছিলাম, অন্যদের নিকট হতে বিশেষ কিছু সাহায্য পাইনি। আদিবাসী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য মনে করেই উল্লেখ করলাম। এক হয়, তাদের মনে নেই, অন্যথায় - তারা বিষয়টি আমার নিকট প্রকাশযোগ্য মনেকরেনি।

মুক্তারাম ও চক্রফার নিকট হতে পাওয়া তথ্য ও বহু বারের বহু প্রশ্নের বিনিময়ে আদায় করতে হয়েছে। এই তখন জানতে পারলাম - তারা বিপদে পরে মিশনারীদের নিকট হতে মোট ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহন করেছে, শর্ত - খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় ঋণ পরিশোধ করতে হবে। প্রথমে মিশনারী কর্মীরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য কোন চাপ দেয় নি। খুসিকৃষ্ণের রচিত গান ও উপাসনায় বাধা দেয় নি। পরে ধাপে ধাপে চাপ বৃদ্ধি করে। মুক্তারাম খৃষ্টধর্মের উপদেশ শুনে রতনমণিকেই রত্নযিষু বলে ভাবতে শিখেছে। মুক্তারামের উক্তিতে জানতে পারলাম পরিপূর্ণ ভাবে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার তিনটি ধাপ আছে। মুক্তারাম প্রথম ধাপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু গান যখন করে তখন খুসিকৃষ্ণের রচিত গানই সে গায়। এই নিয়েই যুবক প্রচারকের সংগে তার সংঘর্ষ। যুবকটি গারো সম্প্রদায়ভুক্ত, রিয়াং ভাষা ভাল ভাবেই জানে।

মুক্তারামের সংগে শেষ সাক্ষাৎকালে জেনেছিলাম সে তখনও খুসীকৃষ্ণের রচিত গানগুলি গেয়েই রতনমণিকে রত্নযিষু হিসাবে ভজনা করে। রতনমণির মধ্যে সে যীশুখৃষ্টকে দেখতে পেয়েছে। মুক্তারাম রতনমণির নাম উচ্চারণ করত -'রত্নযীষু' বলে।